নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্যে লেখা গবেষণা অভিসন্দর্ভ

বেগম তাহমিনা আশরাফ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
অক্টোবর ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে বেগম তাহমিনা আশরাফের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্যে লিখিত ও উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ "নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ" অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

২৫.৯.২০০০

ডঃ রফিকুল ইসলাম
অধ্যাপক
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

384636

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
384636

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে। ইংরেজী ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে এবং বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। পরলোকে গমন করেন ইংরেজী ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট এবং বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ই ভাদ্র। ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের উত্তর পাশের মসজিদের পাশে চিরশায়িত আছেন তিনি।

নজরুল ইসলামের জীবনকাল ৭৬ বছর ৩ মাস। এর মাঝে তাঁর সাহিত্যিক জীবনকাল ১৯১৯ থেকে ১৯৪২সাল অর্থাৎ মাত্র ২৩ বছর। এ সময়ের মাঝে তিনি বিচরণ করেছেন কবিতায়, কথাসাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে, বেতারে, অভিনয়ে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, সাংবাদিকতায় এবং সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে। তবে এতসব ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ থাকলেও মূলত কবি হিসেবেই পরিচিতি পান কাজী নজরুল ইসলাম।

আমার গবেষণা সন্দর্ভ ''নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ।'' নজরুলের কথাসাহিত্যে তাঁর সমকালের সমাজ কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তাই পর্যালোচনার বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সমাজ দর্পণ' আলোচনার বিষয় হলেও সমকালের রাজনীতি কিংবা অন্যান্য প্রসঙ্গও পর্যালোচনার প্রয়োজনার্থে উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ নজরুলের সমকালীন সমাজ এক সংকটাপন্ন রাজনীতির কাছে বন্দী ছিল। যা তাঁর প্রতিটি উপন্যাস সহ অধিকাংশ ছোটগল্পে ছায়াপাত ঘটিয়েছে।

নজরুলের তিনটি উপন্যাস 'বাঁধন-হারা (শ্রাবণ ১৩৩৪ আগষ্ট ১৯২৭)' 'মৃত্যুক্ষুধা (মাঘ ১৩৩৬ ইংরেজী ১৯৩০)' এবং 'কুহেলিকা (শ্রাবণ ১৩৩৮ জুলাই ১৯৩১)'। আঠারটি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে তিনটি গল্পগ্রন্থে। 'ব্যথার দান (ফাল্গুন ১৩২৮, মার্চ ১৯২২)' গল্পগ্রন্থে রয়েছে 'ব্যাথার দান, হেনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা এবং রাজবন্দীর চিঠি'। 'রিক্তের বেদন (পৌষ ১৩৩১, জানুয়ারী ১৯২৫)' গল্পগ্রন্থে রয়েছে 'রিক্তের বেদন, বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের নেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামীহারা এবং দুরন্ত পথিক'। 'শিউলিমালা (কার্তিক ১৩৩৮, অক্টোবর ১৯৩১)' গল্পগ্রন্থে রয়েছে 'পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নি-গিরি, এবং শিউলিমালা'। এ ছাড়াও 'বনের পাপিয়া' নামে অপর একটি অগ্রন্থিত গল্পও রয়েছে।

এই তিনটি উপন্যাস এবং উনিশটি ছোটগল্প নিয়েই নজরুলের কথাসাহিত্য সম্ভার। যার প্রকাশকাল ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিধৃত হলেও রচনাকাল ১৯৩০ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম তিন দশক। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক যেহেতু নজরুলের কথাসাহিত্য রচনার সময়কাল তাই এই তিন দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই ''নজরুলের কথা সাহিত্যে সমকালীন সমাজ'' কে পর্যালোচনা করা হলো।

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে উপস্থিত ছিলেন ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখসহ কাজী নজরুল ইসলাম।'' এখানে দেখা যায় প্রমথ চৌধুরী ছাড়া একমাত্র নজরুলই মুসলমান কথা সাহিত্যিক। অপরদিকে তখন রবীন্দ্রনাথের জয়গানে মত্ত সবাই। একমাত্র নজরুলই তখন উন্নত শিরে আগমন করেন বাংলা কথাসাহিত্যে। 'আমি সমাজের কথা বলিতে ব্যাকুল' 'আমি শোষিতের কথা, শোষকের কথা বলিতে ব্যাকুল' এই বাণীতে শপথ নিয়ে তিনি চালনা করেন তাঁর লেখনি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার বিষয় যেহেতু ''নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ'' তাই সমকাল বলতে নজরুলের কথাসাহিত্য রচনার সময়টাকেই এখানে আমি আলোচনা পর্যালোচনাতে তুলে ধরেছি। এ ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকই হচ্ছে আমার পর্যবেক্ষণের সময়কাল। এ সময়ের সমাজ দর্পণের আলোকে ''নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজের'' একটি পৌন:পুণিক পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি আমি।

''প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, লালফৌজ বা রেড আর্মি, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন'' সমকালীন এসব আন্দোলন নজরুলের কথাসাহিত্যে এসেছে খুব স্পষ্ট ভাবে। শুধু তাই নয় নজরুল নিজেও প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন এসব আন্দোলনের অনেকটিতেই। ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রশিক্ষণরত যোদ্ধা।

নজরুলের প্রথম রচনা ''বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'' যখন তিনি রচনা করেন তখন তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে করাচী সেনানিবাসে অবস্থান করছিলেন। করাচী সেনানিবাসে বসে অপরাপর যেসব সাহিত্য তিনি রচনা করেন তা প্রকাশিত পত্র পত্রিকাসহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী	*গল্প*	*সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬*
মুক্তি	*কবিতা*	*বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২৬*
স্বামী হারা	*গল্প*	*সওগাত, ভাদ্র ১৩২৬*
কবিতা সমাধি	*হাসির কবিতা*	*সওগাত, ভাদ্র ১৩২৬*
তুর্কী মহিলার ঘোমটা খোলা	*প্রবন্ধ-*	*সওগাত, আশ্বিন ১৩২৬*
হেনা	*গল্প*	*বঙ্গীয় মুসলমান সা:প: কার্তিক ১৩২৬*
আশায়	*হাফিজের গজল*	*প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬*
ব্যথার দান	*গল্প*	*বঙ্গীয় মু: সা: প:, মাঘ ১৩২৬*
মেহের নেগার	*গল্প*	*নুর, মাঘ- ফালগুন ১৩২৬*
ঘুমের ঘোরে	*গল্প*	*নুর, ফাল্গুন ১৩২৬*

এখানে দেখা যায় করাচী সেনানিবাসে বসে নজরুল ছয়টি গল্প রচনা করেছিলেন। এ ছয়টি গল্পের মাঝে একমাত্র 'স্বামীহারা' গল্পটি নিটোল সামাজিক আবহে রচিত। 'ব্যথার দানে' লালফৌজ বা রেড আর্মি মুক্তি সেবকদের আবহ বর্তমান এবং অপর চারটি গল্পেই রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা। 'রিক্তের বেদন' গল্পটি পরে রচিত হলেও এই গল্পে নায়ককে রিক্ত হৃদয়ের হাহাকার ঘুচাবার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করতে দেখা যায়।

'রাজবন্দীর চিঠি' এক রাজবন্দীর আত্মকথা বর্ণনামূলক একটি চিঠি। যে বন্দী কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল থেকে লিখেছে তার প্রিয়তমা মানসীকে। কিন্তু নায়কের রাজবন্দী হবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি কোথাও। তবে ধারণা করা যেতে পারে নজরুল ১৯২২ সালের ২৫শে নভেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দী হিসাবে ছিলেন এবং তাঁর সাজাও হয়েছিল। হতে পারে নজরুল তাঁর সেই রাজবন্দী জীবনের সমকালীন বাস্তবতা থেকেও নিতে পারেন এই গল্পের পটভূমি। তাঁর তিনটি উপন্যাসেই রয়েছে সমকালীন তিনটি বিশেষ রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন। প্রতিটি কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ চিত্রণের সাথে সাথে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিও।

'মৃত্যুক্ষুধা' কিংবা 'দুরন্ত পথিকের' সমকালীন সমাজ ভাবনা নজরুলকে সমকালীন সমাজ বিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানী বা দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একীভূত করে। তবে দার্শনিক বা মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি তত্ত্বকথা প্রচার করেন নি কোথাও। সমাজের একজন সচেতন ও ভুক্তভোগী মানুষ হয়ে সমাজকে তুলে এনেছেন তাঁর কথা সাহিত্যে। যা সমকালীন ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনাও বহন করে।

নজরুলের কথাসাহিত্যের এসব সমকালীন বাস্তবতা,সমকালীন সমাজের একটি পৌন:পুনিক পর্যালোচনা নিয়েই আমার অভিসন্দর্ভ। এই অভিসন্দর্ভটিকে যথাযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে আমি তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সামাজিক পটভূমি। নজরুলের তিনটি উপন্যাসসহ উনিশটি ছোটগল্প বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মাঝেই রচিত এবং এ সময়ের একটি সামগ্রিক সামাজিক পটভূমির আবর্তে এসব কথাসাহিত্যের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে তারই একটি স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নজরুলের উপন্যাসে সমকালীন সমাজ। পটভূমির আলোকে তিনটি উপন্যাসেরই সমকালীন সামাজিক চিত্রটি আলোচিত পর্যালোচিত হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নজরুলের ছোটগল্পে সমকালীন সমাজ। এই পরিচ্ছেদে প্রতিটি ছোটগল্পের প্রকাশের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে সমকালীন সামাজিক চিত্রটি আলোচনা করা হয়েছে।

এবং উপসংহারে ''নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ'' এই অভিসন্দর্ভের পুরো আলোচনার উপর একটি সার সংকলন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা/৫

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সামাজিক পটভূমি/১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নজরুলের উপন্যাসে সমকালীন সমাজ/২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নজরুলের ছোট গল্পে সমকালীন সমাজ/৬৩

উপসংহার/৮১

গ্রন্থপঞ্জি/৮৪

নজরুলের উপন্যাসের প্রকাশকালানুক্রমিক সূচি/৮৭

নজরুলের ছোটগল্পের প্রকাশকালানুক্রমিক সূচি/৮৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সামাজিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন পটভূমির উপরই নজরুলের কথাসাহিত্য সত্তার দন্ডায়মান। উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড়-ঝঞ্জা, উত্থান-পতনের কষাঘাতে নজরুলের বিদ্রোহী মানসিকতা হয় ক্রমাগত নিষ্পেষিত। নজরুল রাজনীতিবিদ ছিলেন, ছিলেন অবহেলিত সমাজের সামাজিক,অর্থনৈতিক বলয়ের প্রতিনিধি, ছিলেন জীবনের শুরু থেকেই সমাজ সচেতন। সমকালীন ভরতীয় সমাজের প্রতি তাঁর ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেই সমাজ ব্যবস্থায় তিনি দেখতে পান সামাজিক কুসংস্কার ও সমাজে নারীর অবস্থান, সংকীর্ণতা, ধর্ম -বর্ণ-লিঙ্গভেদ, মোল্লাতন্ত্র ইত্যাদি। প্রচলিত এসব সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি -বিচ্যুতি নজরুল তাঁর কথাসাহিত্যে নির্দেশের পাশাপাশি আদর্শ সমাজের রূপরেখা ও নির্দেশ করেন।'দুরন্ত পথিকে' নজরুল লিখেছেন,

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশীর সুর ধরিয়া। .....এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ায় এক-আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখনও যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নতুন পথিকের সামনে ধরিয়া বলিল, ''এই দেখ এদের পরিনাম।'' সেই খুলি মাথায় করিয়া নতুন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল, -''আহা এরাই ত আমায় ডাক দিয়াছে! আমি এমনই পরিনাম চাই- আমার মৃত্যুতেই ত আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব!''

নজরুল এখানে যে বিদগ্ধ সমাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর আদর্শ রূপরেখার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সে সমাজের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে মানুষ ও মানবতা, প্রগতি ও আধুনিকতা। নজরুল সমাজের একান্ত ভেতর থেকে বিভিন্ন গলদ, সমস্যা, কুসংস্কার, ভেদ-বৈষম্য অনুদারতা ও অমানবিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর তিন উপন্যাসসহ উনিশটি ছোট গল্পের প্রায় অধিকাংশটিতে এসবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ফলে সমকালের পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর সকল কথাসাহিত্যের মূল বক্তব্য।

সমকালীন তিনটি প্রধান রাজনৈতিক বক্তব্যও উঠে এসেছে তিনটি উপন্যাসে। 'বাঁধন-হারা' 'প্রথম-মহাযুদ্ধে'র আবহে,'কুহেলিকা' 'স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে'র আবহে এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' 'অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' আবহে রচিত। এসব আন্দোলনে তখনকার সমাজ ছিল চরম সংকটাপন্ন। এসব আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সমাজের প্রতিটি স্তরে চলছিল ক্রমাগত পালাবদল। আর এসব পালা বদলের সমকালীন সমাজ চিত্রণ ঘটেছে নজরুলের কথাসাহিত্যে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের গজালের মা'র সংসার কৃষ্ণনগর চাঁদ-সড়কের মুসলমান-খ্রীষ্টান সহবাস, তাদের জীবন যাত্রা, খ্রীষ্টানদের ধর্ম প্রচার, 'কুহেলিকা' উপন্যাসের জমিদারদের ব্যভিচার, মেসের জীবন যাত্রা, জারজ সন্তানের সামাজিক মর্যাদা, 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের মুসলমানদের রীতিনীতি, হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা ব্রাহ্মদের মানবিকতাবোধ এ সবই সমকালীন পটভূমিকে চিহ্নিত করে। যা আজ যুগোত্তর সমাজকেও ধারণ করে আছে।

উনিশটি ছোট গল্পের মাঝে 'ব্যাথার দান' 'হেনা' 'ঘুমের ঘোরে' 'রাজবন্দীর চিঠি' 'রিক্তের বেদন' 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' 'মেহের নেগার' গল্পগুলোতে সমকালীন যুদ্ধ ও রাজনীতির সাথে সমাজ চিত্রণ ঘটেছে। 'সালেক' 'রাক্ষুসী' 'স্বামীহারা' 'পদ্ম-গোখরা নিটোল সামাজিক পটভূমিতে রচিত। 'দুরন্ত পথিক' গল্পটিকে লেখক নিজেই 'কথিকা'

Dhaka University Institutional Repository

বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে কথকের বর্ণনাতে সমকালীন অস্থির সমাজের একটি পটভূমির অবতারণা ঘটেছে।

গবেষণার বিষয় 'সমাজ' হলেও রাজনীতি যেহেতু এর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট যেহেতু নজরুলের কথাসাহিত্যের পটভূমি তাই বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোও খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো।

বঙ্গভঙ্গঃ বাঙালীর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের উপর ইংরেজ সরকারের বরাবরই নজর ছিল বিদ্বেষ পূর্ণ। ১৮৯৯ সালে 'লর্ড কার্জন' এদেশে এসেই এই জাতীয়তাবোধকে দমিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হলেন। বঙ্গ বিভাগের ফলে শাসনকার্য সহজ হবে এটাই ছিল তাঁদের প্রধান যুক্তি। তাছাড়া হিন্দুদের তুলনায় পূর্ববঙ্গের অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মিক উন্নতি সাধনের ইচ্ছে ও তাদের পূর্ণ হচ্ছিল না বলে তারা বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনসাধারণের প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। শাসনের সুবিধার অজুহাতে বঙ্গকে দ্বি-খন্ডিত করা হলেও এরপর প্রবল ভাবে এর বিরোধিতা করে বাঙ্গালী। ঐ দিনই রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেনীর পরিকল্পনায় রাখীবন্ধণ উৎসব শুরু হয়। আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী শিল্প পণ্যের ব্যবহার ও প্রচার এবং জাতীয় ভাবাদর্শের উন্মেষ সাধন। ঐ সময়েই প্রথম 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। গোড়াপত্তন হয় স্বদেশী আন্দোলনের।

নজরুলের কথাসাহিত্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সরাসরি কোন ছাপ পড়েনি। তবে পরবর্তী আন্দোলন সমূহের গোড়াপত্তন হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই। তাই পরবর্তী 'স্বদেশী আন্দোলন','সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' যা নজরুলের কথাসাহিত্যে এসেছে পটভূমি তৈরী করে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ঃ বঙ্গভঙ্গের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই সূত্রপাত হয় স্বদেশী আন্দোলনের। এ আন্দোলনের মূলকথা ছিল বিলাতি দ্রব্য বর্জন ,বিলাতী পোষাক পরিচ্ছদ বর্জন, ভাব ও চিন্তাধারাসহ সর্ব প্রকার বিদেশী আদর্শের পরিবর্তে জাতীয় অর্থাৎ স্বদেশী ভাষা -সাহিত্য, শিক্ষা পদ্ধতি, রাজনীতিক আদর্শ, লক্ষ্য ও পন্থা অবলম্বন। স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৫ সালের শেষে কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে মধ্যপন্থিদের অন্যতম নেতা ও কংগ্রেস সভাপতি 'গোপাল কৃষ্ণ গোখলে' বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বাংলায় বৃটিশ পণ্য বর্জনকে সমর্থন দেন।

এক পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনরত বিপ্লববাদীদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং পরে এ থেকেই সূত্রপাত হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের। স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদী এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে রচিত 'কুহেলিকা' উপন্যাস। নজরুল যখন সিয়ারসোল স্কুলে পড়েন তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক 'নিবারণ চন্দ্র ঘটক' নজরুকে বিপ্লববাদে প্রভাবিত করেছিলেন। ধারণা করা যেতে পারে পরবর্তী জীবনে বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের যে আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় তার সূত্রপাত হয়েছিল এখান থেকেই। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে নিবারণ চন্দ্র ঘটকের ছায়া লক্ষ্য করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে '' এমনি দিনে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' মন্ত্রে এই কল্পনা প্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক স্কুল মাস্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লবী।''

'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' ক্রমে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পরে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মহাত্মাগান্ধীর অহিংস আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল কিন্তু এটাই যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র পথ ছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। এ ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনতো বটেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

'সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদ' সম্মন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু এর উচ্চ ও মহৎ আদর্শ সম্মন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিপ্লব যুগ ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতনের যুগ। বিপ্লবীরা জানতেন ধৃত হইলে তাদের মৃত্যু বা দীপান্তর। সুতরাং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাজ করতে হত। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে নায়কের পরিনতি দেখানো হয়েছে ,

> বজ্রপানি প্রমত্ত প্রভৃতির সাথে জাহাঙ্গীরেরও দীপান্তর হইল। তাহার সত্যকার নাম প্রকাশ পাইল না। জাহাঙ্গীর তাহার নাম বলিয়াছিল স্বদেশ কুমার। সেই নামেই তাহার শাস্তি হইয়া গেল। ফিরদৌস বেগমও দেওয়ান সাহেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়াও কোন কিনারা করিতে পারিলেন না।

বিপ্লববাদীদের জন্য লোভনীয় কোন প্রস্তাব ছিল না। কাউন্সিল ও কর্পোরেশনের সভ্যপদ, মন্ত্রিত্ব প্রভৃতির আশা ছিলনা। বিপ্লবীদের প্রাণে ভারত বর্ষকে স্বাধীন করার আকাঙ্খা এত প্রবল ছিল যে তাদের মধ্যে কোন দুর্বলতাহীনতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ স্থান পায় নাই।'কুহেলিকা' উপন্যাসের তৃতীয় অনুচ্ছেদে সমকালীন এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় ,

> প্রমত্ত চক্ষু মুছিয়া সিক্তস্বরে বলিল, ''আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয়রে অনিম! আমি তোদের চেয়ে কম ভাব প্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল- বায়ু- মাটি - পর্বত- অরণ্যকেই ভালবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ- ভারতের এই মুক দরিদ্র- নিরন্ন- পর পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারত বর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছ-পালার ভারতবর্ষ নয়, আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে- যুগে- পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ । ওরে, ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরে ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়- এ আমার মানুষের - মহা মানুষের মহাভারত !

'কুহেলিকা' উপন্যাসে সমকালীন সমাজের সাম্প্রদায়িক ভাবনার ও প্রকাশ পাওয়া যায় প্রমত্তের সাথে অপর স্বদেশী বিপ্লবীদের। মুসলমান জাহাঙ্গীরকে নিয়ে প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা এবং বিরোধ দেখা যায় তাদের মাঝে। কিন্তু প্রমত্তের প্রবল যুক্তির কাছে তারা মাথা নত করে।

স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, দমন ও শোষণনীতি এসব আন্দোলন একটি আরেকটির পরিবর্তিত রূপ। যা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র । বঙ্গভঙ্গ রোধ করার অভিপ্রায় নিয়েই শুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। ক্রমে তা সন্ত্রাসবাদী এবং দমন ও শাসননীতি আন্দোলনের মধ্যে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। 'কুহেলিকা'র এগার অনুচ্ছেদে এই 'স্বাধীনতার' কথা বলা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

জয়ন্তীর ছোট বোন সন্তান প্রসব করিয়াই মারা যায়। সে ছেলেকে জয়ন্তী লইয়া আসিয়া মানুষ করেন। নাম রাখেন পিনাকপানি। সকলে 'পিনাকি' বলিয়া ডাকিত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গত বৎসর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির মঞ্চেও সে জীবনের জয়গান গাহিয়াছে !..... ফাঁসির পুর্বে ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ''তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?''

পিনাকি হাসিয়া বলিয়াছিল, ''চাই, কিন্তু তুমি তো দেখাতে পারবে না!'' ম্যাজিস্ট্রেট তার শিশুর মত মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল, ''নিশ্চয়ই পারব ! বল কাকে দেখতে চাও?'' পিনাকি তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, ''আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখতে! পারবে দেখাতে?

প্রথম মহাযুদ্ধ ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট পটভূমি তৈরী করেছে নজরুলের বেশ কয়েকটি ছোট গল্পসহ পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা'র। এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ১৯১৪ সালের ৪ই আগষ্ট। জার্মানী বেলজিয়ামেকে আক্রমণ ও অধিকার করলে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানীর বিরুদ্ধে। জার্মানীর পক্ষে অষ্ট্রিয়া এবং ব্রিটেনের সাথে ফ্রান্স ও রাশিয়া এই দুই দলের মাঝে জলে ও স্থলে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ রূপে এই যুদ্ধে ভারত অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় সৈন্য বাহিনী এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছে এবং জার্মান সৈন্য যখন দ্রুত বেগে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ভারতের গুর্খা সৈন্যদলের রণকৌশল ও বিক্রমই যে তাদের অগ্রগতি রোধের প্রধান কারণ তা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

নজরুলের কথাসাহিত্যের শুরুই হচ্ছে 'বাঙ্গালী পল্টন ময়দান' থেকে। করাচী সেনানিবাসে বসে নজরুল লেখেন প্রথম ছোটগল্প 'বাউন্ডলের আত্মকাহিনী'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নজরুল ১৯১৭ সালের শেষের দিকে সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। নওসেরায় তিন মাস প্রশিক্ষণের পর তার কোম্পানীর সাথে তিনি করাচী যান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নজরুল ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মার্শাল হাবিলদার পদে উন্নিত হয়েছিলেন। 'হেনা' গল্পটিতে এর প্রমাণও রয়েছে এভাবে ''*আমার কমান্ডিং অফিসার বলেছেন, তুমকো বাহাদুরি মিল যায়েগা, আজ আমি হাবিলদার হলুম*''। নজরুলের সামরিক জীবনের অধিকাংশ সময়ই করাচী কেটেছে। করাচী সেনা নিবাসে বসে নজরুল রচনা করেছেন 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' 'স্বামীহারা' 'হেনা' 'ব্যাথার দান' 'মেহের নেগার' 'ঘুমের ঘোরে' ছোটগল্প। তার মাঝে 'হেনা', 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' চারটি গল্পেই রয়েছে তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি।

১৯০৫সালে জার্মান সৈন্য পোল্যান্ড দখল করে এবং বৃটিশ সৈন্য দার্দানেলিসে তুর্কীদের হস্তে পরাজিত হয়। ইতালী, ইংলেন্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে যোগ দেয়। অপরপক্ষে বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়ে সার্বিয়া দেশটি অধিকার করে। জার্মনী ডুবোজাহাজের (Submarine)সাহায্যে ব্রিটিশের বহু বানিজ্যতরী এবং 'লুসিটানিয়া' নামক ইংরেজের একটি যাত্রীবাহী জাহাজ ১২০০ যাত্রীসহ ডুবিয়ে দেয়। ১৯১৬ সালে এই দুই দলের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকলেও এবং বহু লোকের লোকক্ষয় হলেও ইংরেজরা ফ্রান্সে জার্মান সৈন্য হটাইতে পারে নাই এবং জার্মানরাও ফরাসী সৈন্যকে দুর্ভেদ্য ভার্ডুন সীমান্ত হটাইতে পারে নাই। রুমানিয়া ইংলেন্ড ও ফ্রান্সের সাথে যোগ দেয় কিন্তু জার্মান সৈন্য ঐ দেশ অধিকার করে। পশ্চিম এশিয়ার একটি বৃহৎ ভারতীয় সৈন্য দল কুট নামক স্থানে তুর্কীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৯১৭সালে বাণিজ্যতরী বিনষ্ট হওয়ার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

ইংলেন্ডে বিষম খাদ্যসংকট উপস্থিত হয় এজন্য যে এদেশে খাদ্যদ্রব্য বেশীর ভাগই বাইরে থেকে সমুদ্র পথে আসত। আমেরীকার যুক্তরাজ্য কয়েকটি বাণিজ্যতরী জার্মানীর ডুবোজাহাজের আক্রমণে ধবংস হয়। এর ফলে যুক্তরাজ্য জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপরপক্ষে অর্ন্তবিদ্রোহের ফলে রাশিয়া যুদ্ধ চালাতে অসমর্থ হয়। ফ্রান্সের এক রণক্ষেত্রে এ বছরের জুলাই হতে নভেম্বরের মধ্যে প্রায় তিন লাখ ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয়। ইতালিও বিশেষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় ধ্বংস যজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে 'হেনা' গল্পে।

> ও! কি আগুন বৃষ্টি! আর কি তার ভয়ানক শব্দ! -গুড়ুম- দ্রুম- দুম! আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না। যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে! গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তাহলে একদিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত।

নজরুল কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি তবে বেশ কয়েকটি গল্পে এবং বাঁধন-হারা উপন্যাসে স্থান-কালসহ তিনি যুদ্ধের যে বিভীষীকাময় রূপ বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় একটি যুদ্ধে হলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী নিরপরাধ বেলজিয়ামকে আক্রমণ ও অধিকার করলে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একত্রে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে প্রচার করলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর শক্তি খর্ব করা। এই রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধিটাই ছিল প্রধান যা পর্দার আড়ালে থেকে পরিচালিত হত। এ জন্য মিত্রশক্তি প্রথম থেকেই ঘোষণা করে বসল, জগতে স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্যই তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বার বার প্রচারিত ঘোষণার মর্ম এই যে, মিত্রশক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য জগতে ছোট বড় সকল জাতিই যেন স্বাধীনতা রক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছেমত দেশ শাসন করতে পারে এবং কোন দেশ অন্য দেশের উপর কোন প্রকার প্রভুত্ব স্থাপন করতে না পারে এর সুষ্ঠু এবং সুন্দর ব্যবস্থা করাই তাদের লক্ষ্য।

মিত্রপক্ষের এই মতবাদের প্রেক্ষিতে ভারতবাসীর স্বাধীকারের দাবী স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাদের অন্তরের ইচ্ছে যাই হউক তাদের মুখের কথা ভারতীয় দাবীর সম্পূর্ণ অনুকূলে ছিল। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ (Asquith) তাঁর দেশবাসীর নিকট আবেগময় ভাষায় বলেছিলেন ''জার্মানী ইংল্যান্ড জয় করে এ দেশ শাসন করছে, কর আদায় করছে, সমস্ত উচ্চ রাজপদে জার্মানদেরই নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তারাই ইংল্যান্ডের, আইন প্রণয়ন করছে, বৈদেশিক নীতি গঠন করছে- বিদেশীর অধীনতার এই প্রকার চরম দুর্গতির কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। এই বক্তৃতা পাঠের সাথে ভারতবাসীদের মনেও এই প্রশ্নই জেগে উঠল যে, আমাদের দেশে ইংরেজ জাতিয়তা ঠিক এ রকমই প্রভুত্ব করছে। ভারতবাসীর এই চিন্তা ও মনোভাব ক্রমে সারা দেশে সোচ্চার হয়ে উঠল। এই মহান আদর্শের স্বীকৃতি এবং যুদ্ধে ভারতের সৈন্য, অর্থ ও যুদ্ধোপকরণের সরবরাহ এই দুই দাবীতে ভারতবাসীরা স্বায়ত্ব শাসনের নায্য দাবী প্রচার করতে লাগল। ১৯১৬ সালের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গৃহীত হল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে ইংল্যান্ড ভারতকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিবে না কিংবা যুদ্ধ শেষেও যে নিশ্চিত দিবে তার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। কাজেই 'অ্যানি

Dhaka University Institutional Repository

বেসান্ট ও বালগঙ্গাধর তিলকে'র নেতৃত্বে স্বায়ত্ব শাসন (Home Rule) আন্দোলন সমগ্র দেশে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এই আন্দোলনই পরে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নিল।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং রুশ বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকাতে রচিত হয়েছে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। 'খিলাফত' শব্দটি এসেছে 'খলিফা' থেকে। 'খলিফা' যে জায়গাটুকুর উপর তার কর্তৃত্ব পরিচালনা করতেন মুসলিম বিশ্বে সেই জায়গাটুকুকেই 'খিলাফত' নামে অভিহিত করা হত। ১৯১২ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তুরস্কের সম্রাট ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর খলিফার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয় এবং ভারতের মুসলিম সমাজকে তা বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ করে। তুরস্কের খলিফার প্রতি ইংরেজ ও তাহার মিত্র শক্তির দুর্ব্যাবহারই খিলাফত আন্দোলনের কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু পরাজয়ের পর যে সন্ধি হয় তাতে তুরস্কের রাজ্যসীমা ও শক্তি অনেক হ্রাস পায়।যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, তুরস্কের কোন অনিষ্ট করা হবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সে আশ্বাস রক্ষা না করায় ভারতীয় মুসলমানগণ ক্ষুব্দ হয়ে উঠে। ফলে ১৯১৯ সালের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। ভারতীয় মুসলিম সমাজের অসন্তোষের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের সমর্থন জানান লোকমান্য তিলক মালব্য, মতিলাল নেহেরু, গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন 'মৌলানা মুহাম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত আলী' দুই ভাই এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ জননেতা। গান্ধির সাহায্য ও সমর্থনে খিলাফত আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনকে গান্ধিজী ভারতের মুক্তি সংগ্রমের সাথে এক পর্যায়ে ফেলার চেষ্ঠা করেন এবং একই সাথে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার এক বিশেষ অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করে এবং সেই অধিবেশনেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। ফলে দু'টি আন্দোলন একই সাথে চলতে থাকে।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে 'কামাল আতাতুর্ক' তুরস্ককে ধর্ম নিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে খিলাফত আন্দোলনের সার্থকতা লোভ পায়। কাজী নজরুল ইসলাম মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমর্থক ছিলেন। খিলাফত আন্দোলনে তার আস্থা ছিল না। আসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের আর্বিভাব 'মৃত্যু ক্ষুধা ' উপন্যাসের পনের অনুচ্ছেদে ঘটেছে,[৫]

> চাঁদ- সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। লম্বিছাড়া-মত চেহারার লম্বা চওড়া একজন মুসলমান যুবক কোথেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল। ..... যুবকের গায়ে খেলাফতী ভলান্টিয়ারের পোষাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরের ই জামা কাপড় কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের ফেগিস ক্যাপের মত টুপি তাতে কিন্তু অর্ধ চন্দ্রের বদলে পিতলের দ্রুত তরবারি ক্রস। তরবারি ক্রসের মধ্যে হিন্দু মুসলমানদের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট ত্রিশুল। হাতে দরবেশী ধরণের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্ঠি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট

Dhaka University Institutional Repository

প্যান্ট। পায়ে নৌকার মত এক জোড়া বিরাট বুট চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ।

অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে ভারতের সর্ব প্রথম মুক্তি আন্দোলন। যা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। এই আন্দোলনের বীজ বড় হচ্ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ান ওয়ালা বাগের হত্যাকান্ড এবং পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির প্রতিবাদে ১৯২০সালের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এ আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ'।

'গঠন ও বর্জন' এই দুই দিক থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রচারিত এবং আন্দোলিত হতে লাগল। গঠণাত্মক কর্মসূচীর মাঝে ছিল ঘরে বাইরে চরকায় সূতা কাটা ও খদ্দর পরিধান, মাদক দ্রব্য বর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু মুসলমানদের মিলন ও তিলক স্মৃতি তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা চাঁদা আদায়। ''মৃত্যুক্ষুধা''য় আনসারের পরিচয় পর্বে 'খদ্দরেরই জামা কাপড় কিন্তু এত মোটা যা বস্তা বলে ভ্রম হয়' এবং লতিফার ''চড়কা কাটার'' বর্ণনা থেকে অসহযোগ আন্দোলনের গঠন নীতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

অপর দিকে বর্জন নীতির মাঝে ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী খেতাব বর্জন, বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ, অবৈতনিক সরকারী অর্থ পরিত্যাগসহ একইসাথে সবক্ষেত্রে সরকারের সাথে অসহযোগ করে সব বিষয়ে আত্মনির্ভশীল হওয়া। এ আন্দোলনের ফলে এদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। চরকাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সালিশী আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগী এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসার ফলে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিকায় মুজাফফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম 'নবযুগ' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই থেকে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক। এই পত্রিকায় অসহযোগ খেলাফত যুগের যে সব সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নজরুলের সৃষ্টিতে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের মূল বক্তব্য হচ্ছে 'রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'। আনসার নামের এক খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীর দল পরিবর্তন করে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক বিপ্লবীর মধ্য দিয়ে সমকালীন সামাজিক এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে একটি নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম ঘোষণা করেছিল এই বিপ্লব ১৯১৭ সালে। প্রমাণ করেছিল ধনতন্ত্রের অবক্ষয় সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী এবং এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করতে যাচ্ছে, যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এবং উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক দেশের জনগণ, কোন মুনাফা লোলুপ ব্যক্তি বিশেষ নয়।

প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পতন এবং সর্বহারার একনায়কত্ব রাশিয়ার শ্রমিক কৃষককে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তিই এনে দিল না, রুশ অক্টোবর বিপ্লব জাতিগত শোষণের অবসান ও ঘোষণা করল। একটি দেশের একজাতি কতৃক আরেক জাতির শোষণ, এক ভাষা-ভাষী জনগণের সাথে অন্য ভাষাভাষী জনগণের বিরোধ অবলুপ্ত হল এই বিপ্লবের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে । এশিয়ার উজবেকিস্তান,তাজাকিস্তান প্রভৃতি নিপীড়িত পিছিয়ে পড়া এবং মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাজ্যগুলি পেল এক অপূর্ব মুক্তির স্বাদ। ঘোষিত হল জাতিসম্পথের আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার । রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের অর্থ রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেনীর মতো একটা বিপ্লবী শ্রেনীর নেতৃত্ব। বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর কোন দুদুল্যমানতা নেই, নেই কোন পিছুটান বা আপোষমুখীন মনোভাব। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে বলা যায় '' অক্টোবর বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেনীর মতো একটি বিপ্লবী শ্রেণী,সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণী ইসপাতের মতো দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, অল্পকালের মধ্যে দুটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতাও এর ছিল। তৃতীয় বিপ্লবের প্রাক্কালে এই শ্রেণীই শান্তি, ভূমি , স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনগণের নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছিল। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর মতো নেতৃত্ব যদি বিপ্লবে না থাকত, জনগণের আস্থা অর্জন করেছে এমন নেতা যদি বিপ্লবে না মিলত তবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ঘটত না এবং মৈত্রী না ঘটলে বিজয় ও সম্ভব হতো না।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নামকরণের সাথেই নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর পটভূমিটি মিশে আছে। আনসারের বক্তব্যে যখন শোনা যায় ,

> তোমাদের মৃতদেহের উপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ করোনা। যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্রই বা নাই বলব কেন? কোঁচোয়ান! তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে- পশুকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না'।

রাজমিস্ত্রী, ঝাড়ুদার, মেথরদের উদ্দেশ্য করেও আনসার বারবার যে কল্পিক, ঝাড়ু দিয়ে অধিকার আদায়ের কথা বলেছে তা সমকালীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতই কথা বলে।

রুশ বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথিবীতে সূচনা করল একটি নতুন যুগের। সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন দর্শন মানুষের মনকে আন্দোলিত করল। প্রমাণিত হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রী এবং মার্কসীয় তত্ত্বের মত একটি বিপ্লবি তত্ত্বই ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাষণের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিস্তৃত হয়েছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার দেশসমূহে। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী উদ্বুদ্ধ হল এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ও সর্বহারা রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। উপনিবেশ সমুহের নবসৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের মধ্যেও রুশ অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব অনিবার্য ভাবে এসে পড়ল। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনে এই বিপ্লবের প্রভাব পরিলক্ষিত হল। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তারপর ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে যে প্রথম ভাঙ্গন সৃষ্টি করল তার প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুধু ভারতেরই নয় চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং আরো বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলন শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত হল। ১৯১৮ সালে জার্মান বিপ্লব থেকে শুরু করে হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেছিল। ইংল্যান্ডেও শ্রমিক শ্রেণী আইরিশ ব্যাপক ধরণের সাধারণ ধর্মঘটে শামীল হল। পাশাপাশি আইরিশ বিপ্লবীরা বৃটিশ শাসনের উপর আনল প্রচন্ড আঘাত।

রুশ বিপ্লবের প্রতি নজরুল কতটা সমর্থনপুষ্ট ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় নজরুলের সহসৈনিক জমাদার সন্তুরায়ের একটি পত্র থেকে। তিনি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন ;

> নজরুল সেইদিন যেসব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকেই আমরা জানতে ..... পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান, বাজনা, প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লাল ফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল উচ্ছসিত হয়ে উঠেন। ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্র দেখায়।

'ব্যাথার দানের' পটভূমিতে রুশ বিপ্লবের ছাপ রয়েছে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সময় প্রতি বিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্য ভারত থেকে ট্রান্সককেশিয়ায় প্রেরিত বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু সৈনিক দলত্যাগ করে লালফৌজে যোগদান করে। সে সংবাদ রুশ বিপ্লবের খবরের মতই সেনাবাহিনীর বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে নজরুলের কানে পৌছেছিল। এ থেকেই যে নজরুল পরে ''ব্যথার দান'' রচনা করেছিল তা অনুমান করা যায়।

ভারতে এবং এশিয়ার বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অক্টোবর বিপ্লবের আবেদন ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য নিপীড়িত জাতি সমূহের প্রতি আহবান ছিল খোলাখুলি। পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের নিকট বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের নিকট এই বিপ্লব উপস্থিত করেছিল এক প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

নব্যতুর্কি ও মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের অভ্যুত্থান নজরুলের কথাসাহিত্যে কোন পটভূমি তৈরী করেনি। তবে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন যেহেতু তার মানসিকতাকে গড়ে তুলেছে এবং তার কামাল পাশা কবিতাটি নাটকের আঙ্গিকে রচিত, তাই এই সম্পর্কেও খানিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। নব্যতুর্কি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও আধুনিক তুরস্কের উদ্যোক্তা হচ্ছেন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পরে কামাল পাশা জার্মানী যান সমর নায়ক আনোয়ার পাশা ও তালাত পাশার সাথে। কিন্তু জার্মানীর কাছ থেকে সাহায্যের কোন আশা নেই জেনে আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা রাশিয়ায় চলে যান এবং তালাত পাশা জার্মানীতে থেকে যান। কামাল পাশা পড়ে পুনরায় তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। আনোয়ার পাশা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রচ্যের মুসলমান এবং ভারতের খেলাফত আন্দোলনকারীদের বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য চেয়েছিলেন। আনোয়ার পাশা ছিলেন ''প্যান ইসলামিক ও প্যান তুর্কি'' আন্দোলনের প্রবক্তা। রাশিয়ার বলশেভিকদের সমর্থন ছিল কামালের প্রতি কিন্তু প্যান ইসলামিক আন্দোলনের ইংরেজ ও সাম্রাজ্য বিরোধী ভূমিকাতেও তারা সহানুভূতিশীল ছিল। সেই কারণেই কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা মস্কোতে আশ্রয় পান। কামাল পাশা তুরস্কে ফিরে যান অপরদিকে তালাত পাশা জার্মানীতে নিহত হন। আনোয়ার পাশা পড়ে সোভিয়েত সরকারের অনুমতিক্রমে তাসখন্দে যান। সে স্থানে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ সংগঠনের পরিবর্তে তুর্কীস্থানের প্রতিবিপ্লবীদের সাথে যোগদান করেন এবং বৃটিশ ভারত

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের সহায়তায় একটি স্বাধীন তুর্কী রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টায় লাল ফৌজের সাথে সংঘর্ষে নিহত হন।

তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে টানা তিন বছর যুদ্ধ চলে ১৯২০-২২ সাল পর্যন্ত। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সাকারিয়া নদীর তীরে গ্রীক ও তুর্কী বাহিনীর মাঝে যে প্রচন্ড লড়াই হয় সে লড়াইয়ে গ্রীক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। তুরস্কই প্রথম মুসলমান দেশ যে দেশ থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, পর্দা প্রথা বিলোপ ও মোল্লাতন্ত্র দূরীভূত হয়েছিল। এ সব কিছুর উদ্যোক্তা ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশা। মোস্তফা কামাল পাশার এই অসাধারণ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এবং কর্ম সাফল্যের জন্য ''গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি'' বিজয়ী জেনারেল আতাতুর্ককে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তুরস্কের এসব ঘটনাবলী নজরুলকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল কারণ মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কই প্রথম মুসলমান দেশ যেটি ধর্ম নিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে রূপায়িত হয়। কামাল পাশা কবিতাটি নজরুল এই প্রেরণা ও পটভূমিতেই লিখেছিলেন। এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের শুধুমাত্র সমসাময়ীক কালের আন্তর্জাতিক ও সামরিক ইতিহাসের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, সাথে সাথে বাংলা কবিতায় আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্যবহারের অভিনবত্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছিল বৃটিশদের প্রতি বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। বিপ্লবী নেতা সূর্যসেনের নেতৃত্বে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। নারী বিপ্লবী প্রিতিলতাও ছিলেন এ কাজের সহযোগী। অসম সাহসী প্রিতিলতা ধড়া পড়ে গিয়ে সায়ানাইড মুখে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। অপরদিকে সূর্যসেন ধলঘাটে এক সংঘর্ষের পর মাইল তিনেক দূরে গৈরালা গ্রামে এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দশ হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে নেত্ররঞ্জন সেন নামে এক জমিদার তুরস্কে খবর দিলে ১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পুলিশ বাড়িটি ঘেড়াও করে। মাষ্টারদা বাড়ির পেছনের এক বড় গাছের গুড়ি ধরে বেড়া টপকানোর সময় এক গুরখা সিপাহীর হাতে ধরা পড়েন। তার ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি।

নজরুলের কথাসাহিত্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণের সরাসরি কোন ছাপ পাওয়া যায় না। তবে 'কুহেলিকা' উপন্যাসের বিপ্লবী জয়ন্তী দেবীর সাথে নারী বিপ্লবী প্রিতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাদের কর্মজীবনে।

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মাঝে এসব রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো নজরুলের কথাসাহিত্যের পটভূমি তৈরী করেছে। রাজনীতি সমাজের বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সমকালীন অপর যে সব প্রেক্ষাপট পটভূমি তৈরী করেছে নজরুলের কথা সাহিত্যে তা প্রথমেই খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়েছে। তিনটি উপন্যাস এবং উনিশটি ছোটগল্পের পর্যালোচনায় সেসব পটভূমির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নজরুলের উপন্যাসে সমকালীন সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধন-হারা (শ্রাবণ ১৩৩৪ আগষ্ট ১৯২৭)' 'মৃত্যুক্ষুধা (১৩৩৬, জানুয়ারী১৯৩০)' এবং 'কুহেলিকা (শ্রাবণ ১৩৩৮, জুলাই ১৯২১)' এই তিনটি উপন্যাসের মাঝেই নজরুলের উপন্যাস জগত সীমাবদ্ধ। সমাজের তিনটি ভিন্ন আবহকে কেন্দ্র করে তিনটি উপন্যাসের পটভূমি বিস্তার লাভ করেছে। তিনটি আবহই সমকালীন সমাজের মূল উৎপাটন করে তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে।'পটভূমি ' অংশে এসব আবহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি উপন্যাসেরই বাকে বাকে ব্যক্তি নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায়।'বাঁধন-হারা'য় *'আমি পল্টনের গোয়ার গোবিন্দ লোক কিনা,' 'এ ছেলে বাংলাতে জন্ম নিলেও বেদুঈনদের দুরন্ত মুক্তি পাগলামি, আরবীদের মস্ত গোর্দা, আর তুর্কীদের রক্ত তৃষ্ণা ভীম স্রোতবেগের মত ছুটছে এর ধমণীতে ধমনীতে' 'তারা মনে করে, কি বদমায়েশ দুরন্ত ছেলে বাবা! কিন্তু যে-ছেলে মায়ের এত স্নেহ পায়নি, এমন অধিকার পায়নি, সে মাকে মারা তো দূরের কথা, তাঁর কাছে ভাল করে কাছ ঘেঁষে একটা আবদার ও করতে পারে না!.....এই বাঁধন-হারা নুরু যেন বিশ্ব- মাতার বড় স্নেহের দুলাল- ঠিক কোল পোঁছা ছেলের মতন আবদেরে, এক-জিদ্দে একরোখা আর তোদের কথায় বিদ্রোহী!'* 'মৃত্যুক্ষুধায়' আনসারের শারিরীক বর্ণনায় যখন বলা হয় *''শরীরের রং যেমন ফরসা তেমনি নাক-চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে করে তৈরী গ্রীক-ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্তির মত নিখুঁত সুন্দর''*। এবং 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীরের পরিচয় পর্বে যখন বলা হয় *'তাহাকে সকলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উলঝলুল বলিয়া ডাকে। এ নাম কে তাহাকে প্রথম দিয়াছিল এখন আর কেহই বলিতে পারে না। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবী লইয়া বহু বাগবিতন্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে। উলঝলুল, উর্দু শব্দ, মানে এর বিশৃঙ্খল, এলোমেলো'*। এসব উপস্থিতি থেকে গবেষকগণ মনে করেন নজরুল উপন্যাসে তার আত্মকথাই বিবৃতি করেছেন শুধু। গবেষকদের এ ধারণাকে মেনে নিয়েও যদি বলি নজরুল নিজেকে এমন ভাবে সমাজের মাঝে লীন করেছেন বলেই সমাজ দর্পণ বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে পদে পদে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিক 'বিমল মিত্র' বলেছেন, *'একটা সার্থক লেখায় লেখকের ব্যক্তি জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়'*। নজরুলের উপন্যাস পাঠেও সমকালীন সমাজ দর্পণের সাথে তাঁর ব্যক্তি জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনটি উপন্যাসে সমকালীন স্পর্শকাতর তিনটি সামাজিক দিক নির্দেশিত হয়েছে এবং তিনটি দিকের সাথেই ব্যক্তি নজরুল জড়িত ছিলেন একাত্ম হয়ে। সমাজের একজন হয়ে খুঁটিনাটি সামাজিক বিষয়গুলো অবলোকন, অনুধাবন করেছেন অসম্ভব গভীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাসটিতে প্রথম মহাযুদ্ধ, মামার বাড়ির বিদ্বেষপূর্ণ আতিথেয়তা, নারীর অধিকারহীনতা, মেয়েদের প্রতি মেয়েদের হীনমন্যতা, বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া কন্যাকে নিয়ে সামাজিক দুর্ভোগ, অসম বয়সের বিয়ে, মুসলমান-হিন্দু-ব্রাহ্মদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমকালীন এসব সমাজচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

বলাবাহুল্য, নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সৈনিক ছিলেন। নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগদানের তথ্য পাওয়া যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন,

> তখন ইংরেজ জার্মানীতে প্রথম লড়াই লেগেছে। আমরা দু'জনে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে প্রি-টেস্ট দিচ্ছি। শহরে গায়ে চলছে তখন সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড়। হাতে-গরম, মুখে-গরম বক্তৃতা। সবাই এগিয়ে গেল বীরত্বের ঘোড়দৌড়ে। বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমানই শুধু পিছিয়ে থাকবে? দুই বন্ধু খেপে উঠলাম। পরীক্ষা দিয়েই দু'জনে চুপি চুপি পালিয়ে গেলাম

Dhaka University Institutional Repository

আসানসোলে। সেখান থেকে এস-ডি-ওর চিঠি নিয়ে সটান কলকাতা। ------ উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙ্গালী রেজিমেন্টে ঢোকার সব ঠিকঠাক, ডাক্তার বললে, তোমার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আরেকবার মাপতে হবে। দ্বিতীয়বার মাপজোঁকে না মঞ্জুর হয়ে গেলাম। ------ নজরুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে সাথীহারা হয়ে ফিরলাম গৃহকোণে।

'বাঁধন-হারা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। নজরুল বাঙ্গালী পল্টন থেকে ফিরে আসেন ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে। আর ১৯২০ সালেই (বাংলা ১৩২৭ বৈশাখ সংখ্যা) 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'বাঁধন-হারা'। নজরুল তখন যুদ্ধ ফেরত সৈনিক। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটি প্রথম 'তহমিনা' নাম রাখতে চেয়েছিলেন নজরুল। কিন্তু পরে তিনি কেন সে নাম রাখেননি তা জানা যায়নি। উপন্যাসটি পত্রাকারে লিখিত হয়েছে। এটি বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম পত্রোপন্যাস। উপন্যাসে নায়ক নুরুলহুদা লিখেছে মোট পাঁচটি পত্র। তার মাঝে চারটি পত্রই লিখেছে করাচী সেনানিবাস থেকে। উল্লেখ্য, সৈনিক জীবনে নজরুল করাচী সেনানিবাসেই ছিলেন। কাজেই সেনানিবাসের ভেতরের ও বাইরের যে সব বর্ণনা উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে তার সবটাই সমকালীন এবং ঐতিহাসিক সত্যতায় পূর্ণ। যা উপন্যাস আলোচনায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে পটভূমিতে। 384636

নজরুলের পূর্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদী লেখায় মুসলমান সমাজ নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে তেজোদ্দীপ্ত কিন্তু তেজদিপ্তী বিপ্লবী এবং আধুনিক চেতনামন্ডিত জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেন নজরুল। তাঁর তিনটি উপন্যাসসহ ছোটগল্পেও এর সত্যতা ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে গানে কবিতায়, প্রবন্ধে, নাটকে। অর্থাৎ সমগ্র নজরুল সাহিত্যে। নজরুল পূর্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের জন্য উদ্দীপনামূলক আবেদন ছিল ফিকে। উষ্ণ শোনিত যে চড়া রং ও স্বর চায় তার সন্ধান পাওয়া যায় নজরুলে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তারুণ্যে জাগল উচ্ছাস।

'ক্ষুধা সর্বগ্রাসী' মূলত এই বক্তব্যকে ধারণ করেই 'মৃত্যুক্ষুধার' কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধার' যে বিস্ময়কর জীবন ঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে মেহনতি মানুষের দিন যাপনের মধ্য দিয়ে তা বংলা সাহিত্যে বিরল। ক্ষুধার জ্বালায় ধর্মান্তকরণ, মিশনারীদের কৌশলে ধর্ম প্রচার, মৌলভীদের স্বেচ্ছাচারিতা, ডাক্তারদের নারী লুলোপতা, একই পাড়ায় মুসলমান-খ্রীষ্টানদের বসবাস এসব সমকালীন সমাজের চিত্র মৃত্যুক্ষুধার অহংকার। মৃত্যুক্ষুধার রাজনৈতিক দিকটি এসেছে নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা থেকে। কার্লমার্কস, লেলিন, ট্রটসকি, স্ট্যালিন তাঁদের আদর্শে যে নজরুল প্রভাবিত ছিলেন তারই ছায়াপাত ঘটেছে 'মৃত্যুক্ষুধায়'। রাশিয়ার বলশেভিক সমাজতান্ত্রিকতার যে স্পষ্ট রূপ রেখায় 'মৃত্যুক্ষুধার' রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে সেই রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে পটভূমিতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৩৬ এবং ইংরেজী ১৯৩০ সালে। কিন্তু এটির রচনাকাল ১৯২৭ সাল। ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ 'সওগাত' সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে মৃত্যুক্ষুধা। উপন্যাসের শুরুতে কৃষ্ণনগরে চাঁদ-সড়কের উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসটি রচনার সময় নজরুল সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। রফিকুল ইসলাম তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম :জীবন ও সৃষ্টি' গ্রন্থে লিখেছেন

> 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনার পেছনে কৃষ্ণনগরে নজরুলের চাঁদ-সড়ক আবাসের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের দিকে একদিন সকাল বেলা চাঁদ-সড়ক

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ির সম্মুখস্থ আমতলায় বসে নজরুল ও সাহিত্যিক আকবর উদ্দিন বাড়ীর সামনের কলে সদর রাস্তার মুসলমান পাড়া ও খৃষ্টান পাড়ার মেয়েদের কল থেকে পানি নেয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কে আগে পানি নেবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হত, মুসলমান ও খৃষ্টান উভয় দলের মেয়েদের সর্দারনী ছিল, ঝগড়া শুরু হলে তারা এগিয়ে আসত। 'মৃত্যুক্ষুধার' জন্ম ওখান থেকেই। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রথমাংশ কৃষ্ণনগর এবং শেষাংস কলকাতায় রচিত।

'কুহেলিকা' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। এদিক থেকে এটি নজরুলের শেষ উপন্যাস। কিন্তু ইংরেজী ১৯২৭ এবং বাংলা ১৩৩৪ ''নওরোজ'' আষাঢ় সংখ্যা থেকে এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এবং পরবর্তী মোট পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশের পর পুলিশের হাঙ্গামায় ''নওরোজ'' বন্ধ হয়ে গেলে 'সওগাতে' ছাপা হয়। এদিক থেকে এটি নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'আহমেদ মাওলা'র 'নজরুলের কথাসাহিত্য ঃমনোলোক ও শিল্পরূপ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ঃ

> এ্যাডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিখ্যাত Orientation গ্রন্থে জরুরী প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক (Colonial) মহাসন্দর্ভের প্রলম্বিত ছাড়ার মধ্যে কিভাবে প্রকৃত ভূমিসংলগ্ন বাস্তবতা আত্মরূপ ধারণ করেছে।ঔপনিবেশিক প্রতাপ ও প্রভাবের বিপরীতে কিভাবে জিজ্ঞাসুমন নিয়ে অগ্রসর হয়েছে প্রাচ্যচেতনা, জাতীয়তবোধ। তারপর তা রূপ নিয়েছে বিদ্রোহে আর সংঘর্ষে, তৈরী হয়েছে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের Test । ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে প্রাথমিক বোঝাপাড়ার দিনগুলোর উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাই আমরা নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাসে।

'কুহেলিকা' উপন্যাসে নজরুল সমকালীন অপর এমন একটি স্পর্শকাতর সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে এনেছেন যা সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের প্রতি জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার পরিচয় বহন করে। জমিদারদের ব্যাভিচার, সমাজে কামজ সন্তানের আত্মযন্ত্রনাবোধ, সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি যুক্তি প্রদর্শন মূলক ব্যাখ্যা ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। সমকালীন স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উপন্যাসে যে পটভূমি তৈরী হয়েছে 'পটভূমি' অংশে তার স্পষ্ট ধারণা রাখা হয়েছে। তৎকালীন ভারতবর্ষে স্বদেশী যুগে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে হিন্দুদের সাথে মুসলমানরা কেন যোগ দেয়নি এবং যারা দিয়েছে তারাও কেন অনুল্লেখ্য ছিল এসব বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটিতে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে।

প্রকাশের ক্রম অনুসারে তিনটি উপন্যাসেরই আলাদা আলাদা ভাবে ''সমকালীন সমাজ'' প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করা হলো।

বাঁধন – হারা

'বাঁধন-হারা' উপন্যাটি রবিয়ল, নূরুল হুদা, মনুয়র, রবিয়লের মা, রকিয়া বেগম, রাবেয়া, মাহবুবা, সোফিয়া, মাহবুবার মা আয়েশা বেগম, সাহসিকা এবং শিশু চরিত্র আনারকলির মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসে সর্বমোট ১৮টি পত্রের মধ্য দিয়ে এই চরিত্রগুলো একটি কাহিনীর অবতারনা করেছে এবং এই কাহিনীর মধ্যদিয়ে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে সমকালীন একটি সমাজচিত্র। 'বাঁধন- হারা' উপন্যাসটিতে সমকালীন যেসব সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে পর্যায় ক্রমে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধ। উপন্যাসের নায়ক নূরুলহুদা প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক। পাঁচটি পত্র রয়েছে তার।এর মাঝে চারটি পত্রই সে লিখছে করাচী সেনানিবাস থেকে।নজরুল ইসলামও ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক।সৈনিক জীবনে নজরুল করাচী সেনানিবাসে ছিলেন 'রফিকুল ইসলামের' 'কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি' গ্রন্থটিতে তার উল্লেখ রয়েছে,

> নজরুলের কোম্পানি নওশেরায় ৪৬নং পঞ্জাব রেজিমেন্টের সঙ্গে এবং করাচীতে ১৬নং রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে শিক্ষাণবিশীর জন্য সংযুক্ত ছিল।করাচী সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্য চর্চা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য আশ্রিতই ছিলনা, বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের সঙ্গেও তার বিলক্ষণ যোগাযোগ ছিল। তিনি কলকাতার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকাগুলির গ্রাহক ছিলেন,'সওগাত' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি তার গ্রাহক হন এবং কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে দেন। 'সওগাত' পত্রিকায় সেজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল 'নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সওগাত পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মোঃ কাজী নজরুল ইসলাম; বাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার,করাচী।

'বাঁধন-হারা' নজরুল করাচী সেনানিবাসে বসে রচনা করেননি তবে সেনানিবাসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সমকালীন সংঘটিত যুদ্ধের বাস্তব বর্ণনার ভিত্তিতে রচনা করেন। করাচী সেনানিবাসে থেকে নবম পত্রে ভাবী ওরফে রবিয়লের স্ত্রীকে যুদ্ধের একটি বাস্তব বর্ণনাসহ নূরুলহুদা লিখেছে

> আমাদের 'মোবিলিজেশন অর্ডার' বা যুদ্ধ সজ্জার হুকুম হয়েছে।তাই চারদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেছে।খুব- শীঘ্রই আরব- সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে , তাই আমার আনন্দ আর আমাতে ধরচে না। আমি চাচ্ছিলাম আগুন - শুধু আগুন সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে বাইরে ভিতরে আগুন , আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে, আর দেখি কোন আগুন কোন আগুনকে গ্রাস করে নিতে পারে আরো চাচ্ছিলাম মানুষের খুন। ইচ্ছা হয়, সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর ঘাড় মুচড়ে চোঁ চোঁ করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নেই তবে আমার কতক তৃষ্ণা মেটে। কেন মানুষের ওপর আমার এত শত্রুতা? কি দুষমনী করেছে তারা আমার? তা আমি বলতে পারবোনা। তবে তারা আমার দুষমন নয়, তবুও আমার তাদের রক্তপানের আকুল আকাঙ্খা।

উদ্ধৃতিটিতে একজন যুদ্ধ সৈনিকের বিপক্ষদলের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা উপচে পড়ছে। মেসোপটেমিয়া যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি তাবু পড়েছিল এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। একাদশ পত্রটিও করাচী সেনানিবাস থেকে লিখেছে নূরুল হুদা বন্ধু মনুয়য়ের উদ্দেশ্যে। পত্রটিতে সেনানিবাসের অভ্যন্তরের নানা নিয়ম-অনিয়ম, সেনা অফিসার এবং সৈনিকদের নানান ফাঁকি-ঝুঁকি এবং একনিষ্ঠতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে,

> হাবিলদারজী আজ যে রকম দু'ঘন্টা ধরে আমায় মাটি খুঁড়িয়েছে! এমন 'কেঠো' হাতেও ফোসকা পড়িয়ে তবে ছেড়েছে! - হাঁ এই হাবিলদার কিন্তু এক ব্যাটা ছেলে বটে! একেই ত বলতে হয় সৈ-নি-ক-পু-রু-ষ!আমায় পুরো দুটি ঘন্টা গাধার চেয়েও বেহেজ খাঁটিয়েচে, একবার কপালের ঘাম মুছতেও দেয়নি-এমনি জাঁক! অত কষ্টের মধ্যেও আমার তাই

Dhaka University Institutional Repository

একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আনন্দ শিরায় শিরায় গরম হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল, এবং তা এই ভেবে যে, আহা আর কেউত এমন করে দুঃখ দিয়ে আমার সব কিছু ভুলিয়ে দেয়না? এমনি কঠোরতা -না, এর চেয়েও সাংঘাতিক পুরুষত্ব আমি সব সময় চাইচি, কিন্তু পাই খুব কম! তাই আমার শাস্তির দরুন ঐ দু'ঘন্টা খাটুনি হয়ে যাবার পর আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে জোড় দুটো থাপ্পর কষিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম। তিক্ষ্ণ উৎসাহের চোটে থাপ্পর দুটো এতই রুক্ষ আর বে- আন্দাজ ভারী হয়ে পড়েছিল যে তার চোখে সত্য সত্যই 'বুগজুগুনি' জ্বলে উঠেছিল। তাঁর চোখের তারা আমড়ার আঁটির মতন বেরিয়ে পড়লেও লজ্জার খাতিরে তিনি কিছুই হয়নি বলে কাপাস - হাসি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে কিন্তু তিনি সানন্দে স্বীকার করেছেন যে, আমি বাস্তবিকই তাকে একটু বেশী রকমই বে-সামাল করে ফেলেছিলাম এবং তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, এ-রকম কায়ে পড়লে দিনেও তারা দেখা যেতে পারে। তবু এই হাবিলদারজীকে বাহাদুর পুরুষ বলতে হবে; কারণ অন্যান্য নায়ক হাবিলদারদের মতন সে অপরাধীকে না ঘাঁটিয়ে বসে থাকতে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে না কর্তব্যে অবহেলা করে না। তাই আমাদের সৈনিক সংঘ এর নাম রেখেছে পাষন্ড দুষমন সিং। এ বেচারা লেখা-পড়া জানে কম, কিন্তু 'নাচো কুদো ভুলো মৎ'. অর্থাৎ কাজের বেলায় ঠিক একদম ঘড়ির কাটার মত! তাই আমাদের শিক্ষিত হামবাগের দল এখনো সাধারণ সৈনিক এবং ইনি শীগগীরই ভারপ্রাপ্ত সেনানী হতে যাচ্ছেন। ..... পল্টনে এসে গাফেলীই ত এক মহা অন্যায়, তার উপর ব্যাটা ছেলের আবার দুর্বলতা দেখদেখি - পাছে বাংলার ননীর পুতুলদের নধর গায়ে একটু আঁচ লেগে তা গলে যায়, তাই তাদের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে উচ্চ সেনানীদের দিনকানা করা হয়। যেই কোন লেফটেনেন্ট কাজ দেখতে আসেন, অমনি তারা এমনি নিষ্ঠিষ্ট মনে, এত জোরে কাজ করতে থাকেন যে, তা দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও 'সাবাস জোয়ান' বলবার কথা। কিন্তু সে যখন দেখে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা কাজ হওয়া উচিত ছিল, তার এক চতুর্থাংশও হয়নি, তখন বেচারার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না! গভীর গবেষণা করেও তার গোবরগাদা মগজে এর কারণটা আর সেদোয় না- আর কাজেই তাকে বলতে হয় 'বাঙ্গালী জাদু জানতা হেয়!'

বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা যুদ্ধ করার মত মহান ব্রত নিয়ে সৈনিক বেশেও যে কর্মে কেমন অবহেলা করে নজরুল কৌতুক ভরে তা জানিয়ে দিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাবুতে থেকেও বাঙ্গালী তখনও যে কতটা নীচ মনোবৃত্তির ছিল 'বাঙ্গালী যাদু জানতা হেয়' এই উক্তির মধ্য দিয়েই তা ফুটে উঠে। বাঙ্গালীর দায়সারা গোছের এ মনোভাব শিক্ষিত হয়েও তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। নজরুল নিজে যদি সৈনিক ক্যাম্পে না থাকতেন তাহলে সমকালীন এ সমাজ চিত্র কিছুতেই এত বাস্তবতা নিয়ে ফুটে উঠত না। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাদের দায়সারা গোছের কাজ, একনিষ্ঠতার অভাব, শিক্ষিত হয়েও অপরদিকে অশিক্ষিত সৈনিকদের একনিষ্ঠতার ফলে কর্মে পদোন্নতি ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নজরুল তুলে ধরেছেন। আবেগ সর্বস্ব হয়ে কিংবা ঘটনা বর্ণনার চমৎকারিত্বের মধ্য দিয়ে তিনি এখানে কিছু উপস্থাপনা করেননি।

অষ্টাদশ পত্রটি নূরুলহুদা বোগদাদ থেকে লিখেছে সাহসিকতার উদ্দেশ্যে। পত্রটিতে নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ, যন্ত্রণা, পাওয়া না পাওয়ার কথাই মূলত ব্যক্ত হলেও তার সৈনিক জীবন সম্পর্কে এক জায়গায় লেখা রয়েছে ''আমাদের পল্টন শীগগীর ফিরে যাচ্ছে। শীগগীর সব ভাইরা আমার দেশে ফিরবে'' এখানে পল্টন ভেঙ্গে যাবার পর তাদের দেশে ফেরার একটা ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে। দ্বিতীয় পত্রটিতে বন্ধু মনুয়রকে সেনানিবাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে নূরুলহুদা লিখেছে-

Dhaka University Institutional Repository

> আজ ভোর হ'তেই আমাদের পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘমল্লার রাগিণীর যার যত গান জমা আছে স্টকে কেউ আজ গাইতে কসুর করছেন না। কেউ ওস্তাদী কায়দায় ধরছেন- 'আজ বাদরি বরিখেরে ঝমঝম!' কেউ কালোয়াতী চালে গাচ্ছেন 'বধু এমন বাদরে তুমি কোথা!'..... গান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দু'চার জন সমঝদার টেবিল, বই, খাটিয়া যে যা পেয়েছেন সামনে তাই তালে-বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছেন। এক একজন যেন মূর্তিমান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।

সৈনিক ক্যাম্পের সমকালীন এ চিত্রটির সত্যতা পাওয়া যায় রফিকুল ইসলামের 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন-

> করাচী সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্য সাধনা এবং বিশ্ব সংবাদ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত চর্চাও চলছিল, সেনানিবাসে নজরুলের ব্যারাকের সামনে নিয়মিত গানের আসর বসত। কোন গান খুব জমে উঠলে সৈনিকেরা 'চালাও পানসি বেলঘরিয়া, 'ঘি চপচপ কাবলী মটর' ঘি চপচপ কাবলী মটর, 'দে গরুর গা ধুইয়ে, ধুয়া তুলে বিচিত্র উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়তো।

১৯১৭ সালের শেষের দিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে। সামরিক জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটান করাচী সেনানিবাসে। করাচী সেনানিবাস থেকেই শুরু হয় নজরুলের সাহিত্যিক জীবন। নজরুলের সৈনিক জীবনের এসব তথ্য এবং করাচী সেনানিবাস থেকে 'বাঁধন-হারা'র বিভিন্ন চরিত্রের কাছে নূরুলহুদার পত্রসহ অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের নূরুলহুদার বাঁধন- হারা জীবনের মনস্তাত্বিকমূলক ব্যাখ্যা দান থেকেই গবেষকগণ নজরুলের এই রচনাকে তার আত্মজীবনীমূলক রচনা বলে থাকেন। কিন্তু এ অভিযোগ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ছোঁয়া ছাড়া কোন লেখকেরই কোন সার্থক রচনা সম্ভব নয়। আর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ছোঁয়া এবং আত্মজীবনী মূলক রচনা এক নয়। একে আত্মজীবনীমূলক না বলে বরং বলা যেতে পারে লেখকের সমকালীন সমাজ সচেতনতা। 'বাঁধন-হারার' প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিও তাই।

মাতৃস্নেহের শাশ্বত রূপ। মা গর্ভধারিণী না হলেও মা যে শুধু মা-ই বাঙালী মায়ের এই পরিচয়টি ফুটে উঠেছে চতুর্থ পত্রটিতে। পত্রটি রবিয়লের মা লিখেছে নূরুলহুদাকে। মা হারা নূরুলহুদার প্রতি তার মাতৃস্নেহের প্রকাশ ঘটেছে,

> ওরে, তোরা কি করে মায়ের মন বুঝবি? তা যদি বুঝতিস তবে আর এমন করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করতিস নে আমায়! নাই বা হলাম তোর গর্ভধারিণী জননী আমি, তবু আমি কোনদিন তোকে অন্যের বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। একটা কথা আছে, 'পেটে ধরার চেয়ে চোখে ধরা বেশী লাগে।' তোরা এ কথা বুঝতে পারবিনে।

মামার বাড়ির আতিথেয়তা। ছড়ার ছন্দে প্রচলিত একটি লোক গাঁথা আছে *'তাই-তাই- তাই, মামা বাড়ি যাই! মামা বাড়ির দুধ ভাত, পেট ভরে খাই! মামি এল লাঠি নিয়ে, পালাই পালাই।'* প্রচলিত এ গাঁথার সমকালীন একটি চমৎকার সমাজ চিত্রণ ঘটেছে সপ্তম পত্রটিতে। পত্রটি লিখেছে মাহবুবা বান্ধবী সুফিয়াকে । মাহবুবার বিয়ের তারিখ হয়েও বিয়ে ভেঙ্গে গেলে কন্যা দায়ের সামাজিক টানাপোড়েণে মাহবুবার বাবা মারা যান । তারপর তার মা মেয়েকে নিয়ে সামাজিক দায় এড়ানোর জন্য আশ্রয় নেন ভাইয়ের বাড়িতে অর্থাৎ মাহবুবার মামার বাড়িতে। মামার বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর সেখানকার যে অমানবিক

Dhaka University Institutional Repository

আতিথেয়তার স্বীকার হয় তারা তাই সে খুব স্পর্শকাতর ভাষায় লিখে জানায় বান্ধবী সুফিয়াকে।

> হ্যাঁ মামার বাড়ির সকলে যেই জানতে পেরেচে যে, আমরা খাস- দখল নিয়ে তাঁদের বাড়ি উড়ে এসে জুড়ে বসার মত জড় গেড়ে বসেচি, অমনি তাদের আদর আপ্যায়নের তোড় দস্তর মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।..... মামুজিরা আমায় খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু তারা ত দিন রাত্রি ঘরের কোণে বসে থাকেন না যে সব কথা শুনবেন। আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের! তার উপর আবার এক এক জনের চাল এক এক রকমের। কেউ যান ছার্তকে, কেউ যান কদমে, কেউ যান দুলকি চালে। কথায় কথায় টিপ্পনী, কিন্তু মামুজিদের ঘরে দেখলেই আমাদের প্রতি তাঁদের নাড়ীর টান ভয়ানক রকমের বেড়ে উঠে, আমাদের পোড়া কপালের সমবেদনায় পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বা উনুনে কাঁচা কাঠ দিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদেন। মামুজিরা বাইরে গেলেই আবার মনের ঝাল ঝেড়ে পূর্বের ব্যবহারের সুদশুদ্ধ আদায় করে নেন।

নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য কিংবা নারীর অধিকার হীনতা। নারী যে কেবল নারী, ঘরের অন্যান্য আসবাবের মত নারীও একটি আসবাব, নারীর এ অবস্থানের সমাজচিত্র পাওয়া যায় সপ্তম চিঠিতে। চিঠিটি মাহবুবা লিখেছে বান্ধবী সুফিয়াকে। পুরুষরা নারীকে ভাত রান্না আর ছেলে মানুষ করার বাইরে অন্যকিছু ভাবতে পারত না। এই সমাজচিত্র এখন ও বর্তমান। শহরের গোটাকয় শিক্ষিত নারী কিংবা ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে হয়ত উত্তর আধুনিকতার হাওয়ায় অধিকার আদায় করে নেয়। পুরুষের পাশাপাশি চলার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু অধিকাংশ নারী এখনও বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সমাজ দর্পণের নারী হিসেবেই জীবন বাহিত করছে। নারীরা যে পুরুষের চোখে কতটা ছোট এবং অর্থহীন সপ্তম চিঠি থেকে তার কিছু উদ্বৃতি তুলে ধরা হলো ১

> খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতেই পাঠিয়েছেন, আমাদের হাত পা যেন পিঠমোড়া করে বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই। খোদা -না- খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি? কাজেই আছে আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ, সব দোষ চাপাই নন্দ-ঘোষ স্বরূপ অদৃষ্টেরই ওপর ! সেই মান্দাতার আমলের পুরানো মামুলী কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজতক অ-দৃষ্ট। .....আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি! আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হযনি দুনিয়ায় এখনো, কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিন্ড। ভাত রেধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তাক নাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসী বৃত্তিই করে আসচি, কারণ হযরত আদমের বাম পায়ের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি । বাপরে বাপ? আজ সেই কথা টলবে? এসব কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে পড়ে। কোন কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষদের পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহশত আর সে সব কেতাব ও আইন কানুনের রচরিতা পুরুষ। .....এমন কেউ নেই আমাদের ভেতর যিনি এই সব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে আমরা অসূর্য্যম্পশ্যা বা হেরেম জেলের বন্দিনী হলেও নিতান্ত চোর দায়ে ধরা পড়িনি । অন্তত: পর্দার ভেতরেও একটু নড়েচড়ে বেড়াবার দখল হতে খারিজ হয়ে যাইনি। আমাদেরও শরীর রক্ত মাংসে গড়া; আমাদের অনুভব শক্তি, প্রাণ,আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোতা হয়ে যায়নি। আজকের অনেক যুবকই নাকি উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছেন, কিন্তু আমি একে উচ্চশিক্ষা না বলে, লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশী সঙ্গত মনে করি। কেননা এরা যতই শিক্ষিত হচ্ছেন ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখছেন, আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে। তাঁরা মহিষের মত গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোন কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রচন্ড হুংকারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন।ওদের যে সাত খুন মাফ! হায়!কে বলে দেবে এদের যে, আমাদেরও স্বাধীন ভাবে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে হয় আর অধিকার ও আছে, আমরা ও ভালমন্দ বিচার করতে পারি।

উদ্ধৃতিটুকুর পরতে পরতে নারী হৃদয়ের যে হাহাকার ফুটে উঠেছে তা সমকালীন সমাজের নারীর সামাজিক অবস্থানগত চিত্র। কেতাবে নারীর উপর যে আইন হয়েছে তার উপরও নারীর প্রচন্ড জিজ্ঞাসা। পুরুষের শিক্ষালাভের পরও নারীর উপর যে নীচ মানসিকতা পোষণ এসব চিত্রে কোথাও তা অতি রঞ্জিত বা আবেগ স্বর্বস্ব হয়ে ভাষার চাতুর্যে লেখা হয়নি।

নারীর প্রতি নারীর হীনমন্যতা। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে *'মেয়েরাই মেয়েদের প্রধান শত্রু। মেয়েরাই ছোট করে মেয়েদের।'* সমাজের সাথে আত্মলীন হয়ে সমাজের বুক থেকে এ সত্যতা তুলে এনেছেন নজরুল। মেয়েদের প্রতি পরুষদের রক্তচক্ষুতো আছেই মেয়েদের প্রগতি, অগ্রগতির পথে মেয়েরাও কম অন্তরায় নয়। যা সমকালীন সমাজ বাস্তবতা থেকে নজরুল তুলে আনলেও তা বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটের সাথে একটি পূর্ণ সমাজ দর্পণের কাজ করে। বিজ্ঞানের কিংবা শিক্ষার অগ্রগতি হলেও এ মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি এখনো। সপ্তম চিঠিতে মাহবুবার নিস্ফল আক্রোশ ফুটে উঠেছে ,

> আর শুধু পুরুষদেরই বা বলি কেন আমাদের মেয়ে জাতটাও নেহাৎ ছোট হয়ে গেছে, এদের মন আবার আরো হাজার কেসেমের বেখাপ্পা বেয়ারা আচার- বিচারে ভরা, যার কোন মাথাও নেই, মুন্ডুও নেই। এই ধরনা এই বাড়ীরই কথা। ভয়ানক অন্যায় আর অত্যাচার যেটা, চির অভ্যাস মত সেটার বিরুদ্ধে একটু উচ্চবাচ্য করতে গেলেই অমনি গুষ্টিশুদ্ধ *মেয়ের দঙ্গল আমার ওপর 'মারমুর্তি' হয়ে উঠবে আর গল্লা ফেড়ে চেচিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে* বলবে 'মাগো মা, মেয়ে নয় যেন সিঙ্গিচড়া ধিঙ্গি!এযে জাঁদরেল জাঁহাবাজ মরদের কাঁধে চড়ে যায় মা? আমরা ও দেখে আসচি, সাত চড়ে থুবড়ো মেয়ের রা বেরোয় না, আর আজকাল কার এই কলিকালের কচি ছুঁড়ীগুলো যাদের মুখটিপলে এখনো দুধ বেরোয়, তাদের কিনা সব তাতেই মোড়লী সাওকুড়ী আবার মুখের উপর চোপা!মুখ ধরে পুয়ে মাছের মত রগড়ে দিতে হয়, তবে না ধোঁতা মুখ ভোতা হয়ে যায়। আমাদের ও বয়েস ছিল গো, আজ নয়ত বুড়ী হয়েছি, কই বলুক ত কে বাপের বেটী আছে-ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে? তাতে আর কাজ নেই! একটু জোরে কাশলেও যেন শরমে মরমে মরে যেতাম, আর এখনকার 'খলিফা' মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপলদালালী,যেন অজবুড়ী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ..... রাত্তির দিন এই দাঁত-খিচুঁনি আর চিবিয়ে চিবিয়ে গঞ্জনা দেখেশুনে এই সোজা লোকগুলোর উপর বিরক্তি আসে বটে, তবে ঘেন্না ধরেনি। এদের দেখে মানুষের দয়া হওয়াই উচিত! এর জন্য দায়ী কে? পুরুষরাই তো আমাদের মধ্যে এইসব সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

সমকালীন সমাজের এসব বিশ্লেষণে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো মনস্তাত্ত্বিকের মতো, কখনো দার্শনিকের মতো । মেয়েদের প্রতি মেয়েদের এই হীনমন্যতাও প্রতিষ্টিত করেছে পুরুষরাই। পুরুষরা যে কতদিক থেকে মেয়েদের মাঝে কতরকমের গোড়ামী, সংকীর্ণতা ঢুকিয়ে দিয়েছে তার শেষ নেই। শেষে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের শুদ্ধতা জাহির করেছে। ঘরের স্ত্রীকে সাত পর্দার আড়ালে রেখে নিজে গিয়েছে অন্যনারীর ঘরে । অথচ শেষে সেই অন্য নারীকেও সমাজে পতিতা আখ্যায়িত করে আলাদা করেছে সমাজ থেকে। ওদের স্থান হয়েছে পতিতালয়ে । কিন্তু পুরুষ হচ্ছে না আজও পতিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া কন্যাকে নিয়ে সামাজিক বিপর্যয়। সমকালীন এই সমাজচিত্র বর্তমান সমাজেও প্রকট । তারিখ হয়েও বিয়ে না হলে পরে সে মেয়েকে নিয়ে মেয়ের বাবা-মার কিংবা মেয়ের নিজের জীবনে যে সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে তা বলাই বাহুল্য। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে সমকালীন এই সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে একেবারে বাস্তবের বুকে চিড়ে। কোথাও কোন অতিরঞ্জিত না করে । উপন্যাসের সমসাময়িক পটভূমি থেকে বুঝা যায় এ ব্যাপারটি সমাজ সৃষ্টির গোড়া থেকেই জড়িয়ে আছে সমাজ জীবনের সাথে। নূরুলহুদার সাথে মাহবুবার বিয়ের তারিখ হয়েও ভেঙ্গে যায়। নূরুলহুদা কাউকে কিছু না বলে যুদ্ধে চলে যায়। ফলে তারিখ হয়েও বিয়ে না হওয়া কন্যাকে নিয়ে সমাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে মাহবুবার বাবা অসুস্থ হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। মাহবুবার মা পরে মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। নারী জীবনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ দিকটির চতুর্দশ পত্রটিতে উল্লেখ রয়েছে ;

> এত অপমানের পরও আমরা কোন মুখে সেখানে আবার মুখ দেখাব গিয়ে? এখানে যদি কুকুর বেড়ালের মত অনহেলা হেনহ্যা হয় তাও স্বীকার, তবু আর খোদা যেন ও সালার মুখো না করেন। .....এই যে মাহবুবার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন এটা কার দোষে, কোন বেদনার ঘা সামলাতে না পেরে? তা কি জানো? .....নুরু আপনার একদিকে পালিয়ে গেলো- পালিয়ে বাঁচলো, কিন্তু মাঝে পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম আমরা- গরীবরা। মাহবুবার বাবা সে আঘাত সে অপমান সহ্য করতে না পেরে দুনিয়া থেকে সরেই পড়লেন; মেয়ের ও আমার বুক ভেঙ্গে গেল।

উদ্ধৃতিটুকুতে যে প্রশ্ন, যে আক্ষেপ, যে অভিমান, যে অভিযোগ তা কোন ব্যক্তি কে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও মূলত তা ছুড়ে দেয়া হয়েছে সমাজের কাছে। উপন্যাস পাঠশেষে মনে হয় সমাজে নারীদের এই স্পর্শকাতর বিষয়টিই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই বিষয়টি তুলে ধরার জন্যই গোড়াপত্তন করা হয়েছে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের।

দূতীর মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান। খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই বক্তব্যটি উপস্থাপিত হলেও এটি একটি সমকালীন সমাজচিত্র। বর্তমানে ডাকবিভাগের অতি আধুনিকায়নের ফলে এটি এখন আর দূতীর মাধ্যমে করা হয় না।

অসম বয়সের বিয়ে। মাহবুবার সাথে বীরভূম জেলার শেঙানের চল্লিশোর্ধ এক খুব বড় জমিদারের বিয়ে একটি সমকালীন সমাজ দর্পণ।এ ধরণের বিয়ে বর্তমান সমাজেও প্রচলিত। তবে বর্তমানে সাধারনত কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা মা-রা'ই এই বিয়ের আয়োজন করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে বয়স্ক পাত্রদেরও নির্দিধায় অপরিনত বয়সের সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করতে দেখা যায়। পাত্রের শান-শওকতেও অনেক সময় কন্যার বাবা- মা'রা এ ধরণের বিয়েতে রাজী হন। তখন বয়সের পার্থক্যটা একেবারেই গৌণ হয়ে যায় তাদের কাছে।

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে মাহবুবার মা কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে বিয়েতে রাজী হলেও বয়স্ক জমিদার তার জমিদারী দৃষ্টিভঙ্গিতেই সুন্দরী বাল্যবধূকে ঘরে তুলে আনেন। এবং ক'দিন না যেতেই বাল্যবঁধূকে বিধবার সাজে সাজিয়ে পরপারে পারি জমান। ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক বাল্য বিধবা জমিদার গিন্নীর সন্ধান পাওয়া যায়। চতুর্দশ পত্রটিতে মাহবুবার মায়ের বর্ণনায় জমিদারের পরিচয় পাওয়া যায় ;

> আমার ভায়েরা বীরভুম জেলার শেঙানের এক খুব বড় জমিদারের সঙ্গে মাহবুবার বিয়ের সব ঠিকঠাক করেছেন। তিনি এক মস্ত হোমরা বুনিয়াদী খান্দানের, তবে বয়েসটা চল্লিশ

Dhaka University Institutional Repository

পেরিয়ে পড়ছে এই এইযা। কিন্তু তার আগের তরফের বিবির এক মেয়ে, আর কেউ নেই। তারো আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে; তারো ঘরে ছেলে- মেয়ে। বরের বয়েসটা একটু বেশী তা হলে আর কি করবো! গরীবের মেয়ের জন্য কোন নওয়াব জাদা বসে আছে বল।.....মায়ের আমার বিসর্জন দেখে যেয়ো বোন!

কন্যাদায়গ্রস্ত মাতার আর্তি এখানে স্পষ্ট। অপরদিকে সুন্দরী বাল্যবধু বিয়ে করার ব্যাপারে জমিদারের মানসিকতার উল্লেখ সপ্তদশ পত্রটিতে মাহবুবার জবানীতে পাওয়া যায় এভাবে ,

আমার স্বামী শিকার করে করে প্রধান হয়েছেন। তাঁর হাত পাঁকা, লক্ষ্যও অব্যর্থ। কাজেই আমার রূপের খ্যাতি তার কাছে পৌঁছবার পরেও তিনি চুপ করে করে বসে থাকবেন- তার বীর চরিত্রে এত বড় অপবাদ দিবার সুযোগ তিনি দেননি। ছুঁড়লেন শব্দ লক্ষ্য করে বাণ, বাণের রৌপ্যফলকে বিঁধে আমার বক্ষের অবস্থা যাই হোক তার মুখে হাসি যা ফুটল তা খাঁটি সোনার। এইখানে শুনে খুশি হবে দিদি তার দাঁত সব সোনার! খোদার দেওয়া হাড়ের দাঁতের লজ্জা তিনি দুর করেছেনও দাঁত খসে পড়তেই।

মুসলমান, হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক। এই তিন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি সমকালীন সমাজচিত্র পাওয়া যায় দ্বাদশ পত্রটিতে। পত্রটি ভাবী রাবেয়া লিখেছেন মাহাবুবাকে। মাহবুবার কাছে ব্রাহ্ম গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে সে তিন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা বলেছে। যার থেকে এই তিন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সমকালীন একটি সমাজচিত্র ফুঁটে উঠে,

লোকে বিশেষ করে গোঁড়া হিন্দুরা, কেন যে ভাই ব্রাহ্মদের ঠাট্টা করে, আমি বুঝতে পারি না। আমার বোধহয় ও শুধু ঈর্ষা আর নীচমনার দরুণ। ভালমন্দ সব সমাজেই আছে, তাই বলে যে অন্যের বেলায় শুধু মন্দের দিকটাই দেখে ছোটলোকের মত টিটকারী মারতে হবে এর কোন মানে নেই। আমার পুজনীয়া শিক্ষয়ত্রী ঐ ব্রাহ্ম মহিলার কথা মনে পড়লে এখনো একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর- মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এই মহিমান্বিতা মাতৃ- শ্রী-মন্ডিতা যে ধর্মের নারী, এত অনবদ্যপুত শালীনতা ও সংযম বিশিষ্টতা যে সমাজের নারী' সে ধর্মকে, সে সমাজকে আমি ছালাম করি। ..... এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ ছুঁচ মার্গের ব্যামো নেই, কোন সংকীর্ণতা, ধর্ম-বিদ্বেষ, বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব- মানব যা চায় সেই উদারতা, সরলতা, সমপ্রাণতা যেন এর বাহিরে ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে। আমরা বড় বড় হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি, খুব বেশি করেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছিল, কিন্তু এমন দিল জান- খোলাসা করে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। কোথায় যেন কি ব্যবধান থেকে অনবরত একটা আসোয়াস্তি কাটার মত বিঁধতে থাকে। আমরা তাদের বাড়ি গেলেই তারা হন আর না হন, আমরাই বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, এই বুঝিবা কোথায় কি ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কি! তারাও আমাদের বাড়ি এসে পাঁচ-ছয় হাত দুরে দুরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন, পাছে কোথায় কি অখাদ্য-কুখাদ্য মাড়ান। ..... পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এত বড় ব্যবধান গড়মিল একি কম দুঃখের কথা? ..... আমরা আর যাই হই, কিন্তু কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে বুক বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করবার উদারতা আমাদের রক্তের সঙ্গে যেন মেশানো। তাই এই অবমাননার মধ্যে হঠাৎ এই ব্রাহ্ম সমাজের এত প্রীতি ভরা ব্যবহার যেন এক বুক আসোয়াস্তির মাঝে স্নিগ্ধ শান্ত স্পর্শের মত নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, হিন্দুদের এই ছুঁৎমার্গ বর্তমান সমাজেও বিদ্যমান। আধুনিক শিক্ষার ফলে শহরে বসবাসরত হিন্দুদের মাঝে অনেকাংশে হ্রাস পেলেও গ্রামাঞ্চলে এখনো পুরোপুরি বিদ্যমান। এরা প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ঘরের চারপাশ গোবড় দিয়ে পুঁছে সুদ্ধ করে নেন।

পারস্পরিক সম্পর্ক। সমকালীন সমাজের এটি একটি বিরল চিত্র। যে চিত্র বর্তমান সমাজে নেই বললেই চলে। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের আঠারটি পত্রের সবকটি পত্রই লিখেছে বন্ধু এবং প্রতিবেশী একজন আরেকজনের কাছে। প্রতিটি পত্রের বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশী সম্পর্কের মাঝে আন্তরিকতার যে ছোঁয়া বয়ে গেছে তা এখন নেই। সমকালীন সমাজের এই চিত্রটি খুবই চমৎকার।

জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা। নজরুল ইসলাম যখন 'বাঁধন-হারা' রচনা করেন, সমাজে জমিদারী প্রভাব তখনও ছিল। জমিদারদের চরিত্র, মানসিকতা, ভোগ-লিপ্সা, সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর তাদের রক্তচক্ষু এসব বাস্তব চিত্রগুলো মাহবুবার জমিদার স্বামীর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের আঠারটি পত্রের পর্যালোচনা যেসব সমকালীন সমাজচিত্রের সন্ধান আমি পেয়েছি তা উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হল। তবে উল্লেখ থাকে যে, আমার এ পর্যালোচনা সার্বিক পর্যালোচনা নাও হ'তে পারে।

মৃত্যুক্ষুধা

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটি রচনার সময় নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনরের চাঁদ-সড়কে অবস্থান করছিলেন। চোখে দেখা একটা বাস্তব ঘটনার অবতারণা করে শুরু করেছিলেন উপন্যা-। রচনা। অত:পর নিম্নবিত্ত একটি মুসলিম পরিবারকে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু করে উপস্থাপিত করেছেন সমকালীন একটি সমাজ চিত্র। যেসব চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে সেসব চরিত্রগুলো হচ্ছেপ্যাঁকালে, কুর্শি, প্যাঁকালের মা, প্যাঁকালের মার তিন বিধবা পুত্রবধূ, রুবি, লতিফা ওরফে বুচি, ন'করি ডাক্তার, আনসার, নাজির সাহেব, মিস্ জোন্স এবং দু'টি শিশু চরিত্র পটলি ও হানপে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটির পটভূমি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখন উপন্যাস পর্যালাচনায় যেসব সমাজচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের জীবনচিত্র। এই পরিবারের সদস্যরা হলেন প্যাঁকালে, প্যাঁকালের মা, প্যাঁকালের মার তিন বিধবা পুত্রবধূ, কুর্শি এবং পাঁচি ও তাদের একডজন ছেলেমেয়ে । এই চরিত্রগুলোর মধ্যদিয়ে অতি নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনচিত্র অসম্ভব বাস্তবানুভূতির সাথে উপস্থিত হয়েছে। অতি সাধারণ কোন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যখন তখন ঝগড়া, আবার বিপদে সবকিছু ভুলে গিয়ে একের জন্য আরেকজনের ঝাপিয়ে পড়ার মত বাস্তব চিত্র এখানে পাওয়া যায়। এদের কর্ম জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে

Dhaka University Institutional Repository

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এদের পুরুষরা জনমজুর খাটে-অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐরকমের কোনো একটা কিছু করে। আর মেয়েরা ধান বানে, ঘর গেরস্তালির কাজ কর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দু:খ ধান্দা করে পুরুষদের দু:খ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

সবস্তরের নিম্নবিত্ত পুরুষরা জনমজুর, রাজমিস্ত্রী, খানসামা,বাবুর্চিগিরি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবীকা নির্বাহ করত। পুরুষদের পাশাপাশি স্ত্রীরাও টানাপোড়েণ সংসারের হাল ধরত অন্যের ধান বেনে, কাঁথা সেলাই করে, ঘর গেরস্তালির কাজকর্ম করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে এই নিম্নবিত্তদের জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর। বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজেও তাদের কথা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু যতদুর জানা যায়, বাংলা কথা সাহিত্যে 'মৃত্যুক্ষুধা'তেই প্রথম সার্থক ও সফলভাবে এই নিম্নবিত্তদের সুখ-দু:খ ভরা জীবনচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্টভাবে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী পুরুষ হচ্ছে প্যাঁকালে। রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সে। তারই টাকায় খেয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকে পরিবারের ষোলজন প্রাণী। তাদের দিন যাপনের একটি চিত্র

> প্যাঁকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। সে জানত, কাল থেকে চালের হাড়িতে ইদুঁরের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা বসেচে। তাদের কিঁচির-মিচির বক্তৃতায় আর নেংটি ভলান্টিয়ারদের হুটোপুটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি।কিন্তু চাল যদি বা চারটে যোগার করা যেত ধারধুর করে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুন-শালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও ঘর নিকুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঘরে তাদের চা'লের হাড়িগুলো যেমন ফুটো, চালও তেমনি সমান ফুটো। সেখানে খড় না পেয়ে চড়াই পাখিগুলো অনেকদিন হ'ল উড়ে চলে গেছে। কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশী টানাটানি ছিল তাদের জায়গার। যেটা উনুন-শাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাত্রে জনসাতেকের শোবার ঘর। তারই একপাশে দরমা বেঁধে গোটা বিশেক মুরগী এবং ছাগলের ডাক-বাংলো তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। প্যাঁকালে না খেয়েই চলে গেল। তার মা-ও দেখলে। কিন্তু ঐ শুধু দেখলে মাত্র, মনের কথা অর্ন্তযামীই জানেন, চোখে কিন্তু তার জল দেখা গেল না। রবং দেখা গেল সে তার মেয়ের আঁতুর ঘরে ঢুকে তার খোকাকে কোলে নিয়ে দোলা দিতে দিতে কী সব ছড়া গান গাচ্ছে।

বস্তিবাসীদের জীবনের অন্দর মহলের চিত্র এমনভাবে 'মৃত্যুক্ষুধার' পূর্বে অন্যকোন কথাসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দরিদ্র ঘরে নজরুলের জন্ম, দারিদ্রের কষাঘাতে মায়ামমতা শূন্য বন্দনহীন জীবন, যুদ্ধের হিংস্র ও পৈশাচিক পরিবেশে টিকে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস এবং সর্বোপরি কঠোর জীবনবোধ নজরুলকে জীবন সম্মন্ধে দান করেছে এক অভিনব প্রকাশভঙ্গি। করে তুলেছে আত্মশক্তির উপাসক এবং যুগিয়েছে এদেশের চিরাচরিত নিস্ক্রিয় নির্লিপ্ত ভাব ও অদৃষ্ট কর্মবাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করার তীব্র প্রবৃত্তি । ' মৃত্যুক্ষুধা ' উপন্যাস নজরুলের সেই বোধেরই সফল প্রয়াস।

অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'কৃষক সন্তান (১২৯৪)' যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ' চা - কুলির আত্মকাহিনী (১৯০১) উপন্যাসে সমাজের নীচুতলার কিছু বাস্তবচিত্রের সন্ধান মেলে। কিন্তু সেসবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমাজ চেতনায় অভিষিক্ত। আর নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' সমাজ বাস্তবতায় অভিষিক্ত । প্যাঁকালের পরিবারের এই যে চিত্র উনুনশাল, ঢেকিশাল, রান্নাঘর তিনটিই এক কুঠরীতে এবং রাতের বেলা এখানেই হয় জনসাতেকের শোবার জায়গা । এই চিত্র ১৯২৭ সালে কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কের একটি অতি নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে তুলে আনা। যে চিত্রটির বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্বেই খুব স্পষ্ট একটি ধারণা রাখা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। যেখানে স্ব-শরীরে অবস্থান করছিলেন স্বয়ং উপন্যাসিক। চিত্রটি এতই বাস্তব যে দু'হাজার সালেও তিলোত্তমা ঢাকা শহরের হাজারও বস্তিতে তা বর্তমান। একটি মাত্র কুঠরিতে ওদের জীবনের সকল চাহিদা নিবৃত্ত হয়। আবার সেখানেই হয় পরিবারের সকল সদস্যের শোবার জায়গা।

নিম্নবিত্তদের ঝগড়ার দৃশ্য। নিম্নবিত্ত সমাজের একটি দৈনন্দিন চিত্র হচ্ছে ঝগড়া। চুন থেকে পান খসলেই তারা কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে হাঁটু অব্দি শাড়ি তুলে একজন আরেকজনের প্রতি ঝাল ঝাড়ে । গলা চড়িয়ে। হাত নেড়ে । অঙ্গভঙ্গি করে। বাক্য বানে বিধ্বস্ত করে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে । পাশে থেকে ফোড়ণ কাটে দর্শক। এ তাদের অতি সাধারণ ব্যাপার । আবার পরক্ষণেই হাসাহাসি , ঢলাঢলি । 'মৃত্যুক্ষুধা'র প্রথমেই এমন একটি চিত্র বাস্তবের বুক চিড়ে নজরুল তুলে ধরেছেন একেবারে তাদের নিজের ভাষায় এভাবে ,

> কে একজন ক্রীশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন্ এক মুসলমান মেয়ের কলসী ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়ত একদিন এক জাতিই ছিল-কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রীশ্চান। আর এক কালে একজাতি ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই হাতের দুইটি মেয়েই কম বয়সী এবং তাদের বন্ধুত্ব ও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ঐ মেয়ে দু'টি করেনি। করেছে তারা-যারা এই অনাছিষ্টি দেখেছে। গজালের মা'র পাড়াতে কুঁদুলী বলে বেশ নামডাক আছে। সে-ই 'অপোজিশন লীড' করছে মুসলমান তরফ থেকে। অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা'র মত ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দু'টোর তুলনা মেলে না! -একেবারে সেকালের ভীমকান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতই !গজালের মা গজালের মতই সরু-হাড্ডি-চামড়া সার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায় , ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা'র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না। ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলচে,'হারামখোর, খেরেস্তান কোথাকার!হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন- শুয়োরের মত চর্বি হয়েছে, না লা?'' গজালের মা'কে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসীটা খং ক'রে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে,অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত করে হুংকার দিয়ে উঠল,'তা বলবি বৈ কিলা সুটকি? ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ীর হারাম রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা! ..... পুঁটের মাও খেরেস্তান তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল,আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় হইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! অ'গজালের মা! ঐ জজ সায়েব ও আমাদেরই জাত। আমরা আজার (রাজার) জাত, জানিস্ ? দু,তিনটি ক্রীশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে বলে উঠল 'আচ্ছা বলেছিস মাসী' খাতুনের মা কাঁখে কলসী, পেটে পিলে আর কাঁধে ছেলে নিয়ে এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝে মাঝে মুল গায়েনের দোয়ারকি করার মত গজালের মার সুরে সুর মিলিয়ে দু'একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে, পিলে আর তার কলসী-সমেত সে একেবারে মুল গায়েনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, এবং ক্রীশ্চানদের বৌদের লক্ষ্য করে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লেখাত যায়ই না, শোনাও যায় না।

নিম্নবিত্তদের মাঝে ঝগড়ার এই যে দৃশ্য, এই যে ভাষা তা খুব কাছে থেকে না দেখলে, না শুনলে এমনভাবে উপাস্থাপনা সম্ভব নয়। নজরুল খুব কাছে থেকে সমকালীন এ সমাজচিত্র দেখেছেন, অনুভব করেছেন বলেই এমন একটি চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন। যেখানে আবেগ কিংবা ভাষার অলংকার কিংবা অতিবর্ণনা বলে কিছু নেই।

Dhaka University Institutional Repository

অভাবের চরম অবস্থাতেও একটি নতুন মুখের আগমন কেমন করে দুঃখ ভুলায়। সামাজিক এ চিত্রটি প্যাঁকালের মার সংসার থেকে পাওয়া যায়। পাঁচি প্যাঁকালের একমাত্র বোন। ভাল ঘর বর দেখেই বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্তু তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় অন্তসত্ত্বা অবস্থাতেই বাপের বাড়ি চলে আসে পাঁচি।এখানেই জন্ম হয় তার প্রথম সন্তান। দারিদ্রপূর্ণ বিপন্ন জীবনের আর্ত আহাজারির মধ্যে। পাঁচির সন্তানের আগমনে পরিবারের সকলে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ভুলে যায় না খাওয়ার কষ্ট। শুধু যে দারিদ্রের যন্ত্রণাই ভুলে পাঁচির মা তাও নয় ভুলে যায় তার যোয়ান যোয়ান তিন রোজগেরে পুত্রের অকাল মৃত্যুশোক।

> একটি ছোট্ট শিশু তার যোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকালে মৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে।

এ চিত্র যে শুধু পাঁচির মায়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, এ চিত্র আমাদের সমাজের প্রতিনিয়ত চিত্র। নতুনের আগমনের আনন্দে পুরাতনের বিদায় কষ্ট পুরুপুরি ভুলে যাওয়া সম্ভব না হলেও কিছু সময়ের জন্য ও সে কষ্ট হারিয়ে যায় নতুনের আগমনের মাঝে। সমকালীন সমাজের চিত্র এটি হলেও এ চিত্র সমকালকে অতিক্রম করে চিরকালের মানবিক অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করেছে।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি উক্তিটির যথার্থতা। মৃত্যুক্ষুধার প্যাঁকালের মার তিন বিধবা বৌ এর একডজন ছেলেমেয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত কালে তাদের যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাতে উপরের পংক্তির সাথে দ্বিধাহীন ভাবে একমত পোষণ করা যায়।' চার অনুচ্ছেদে' মেজ বৌ মির্জা সাহেবের বাড়ি থেকে বিড়ালে খাওয়া ফেলে দেওয়া আধ পোয়া দুধ দিয়ে লবনের স্বাদে খুদ গুড়ার সাহায্যে রান্না করলে তা খেয়ে এই শিশুদের ঈদের আনন্দ অনুভবের বর্ণনা পাই,[৬]

> ক্ষীর রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায়- থালা, বাটি, ঘটি, বদনা, তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায়। অপূর্ব সেই ক্ষীর!অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ী। তারই বাড়ীর দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যে-টুকু ফেলে গিয়েছিল, তাই দারোগা গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তার অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ পোয়া দুধকে আধ সের করে ঝি,র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়েছে, তা ঐ আধ সের জলের অনেক বেশী। বাড়ীতে চাল ছিল সে দিন বাড়ন্ত। মুরগির সদ্য খোলা হতে ওঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে খুদ গুঁড়ার রিজার্ভ স্টোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা বাড়ীর দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হল এই উপাদেয় ক্ষীর । এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারাদিনের আহার। এই তাদের ক্ষীর-পরব-ঈদ। .... ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ক্ষীর খেয়ে মহানন্দে 'বৌ পালালো' খেলছে! ওদেরই একজন পলায়ন পরায়না বধু হয়ে তার না জানা বাপের বাড়ির পানে দৌঁড়েছে এবং তার পিছনে বাকী সবাই গাইতে গাইতে ছুটছে বৌ পালালো বৌ পালালো, ক্ষুদের হাড়ি নিয়ে, সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝ্যাটা নিয়ে।

'পাঁচ অনুচ্ছেদে' এরূপ আর একটি চিত্রের অবতাড়ণা ঘটেছে এভাবে-

> ''প্যাঁকালে হাতে চাল- ডাল, বগল তলায় ফুটবল, পকেটে কল্পিক- সুত, আর মুখে পান ও বিড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ছেলেমেয়ে তাকে যেন ছেঁকে ধরল। চাল- ডালের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ দেখে তারা একযোগে চীৎকার করে উঠল। যেন সাপের মাথায় মানিক দেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর মাছের মাথাটা কে খাবে, কে কোন অংশটা খাবে তা নিয়ে একেকজনের সাথে লেগে যায়। মেঝ বৌ মাছ কোটে আর ছেলে-মেয়ের দল মেঝ বৌকে ঘিরে বসে হা করে মাছ কোটা দেখে। একেক জনের ভাবটা এমন যেন কাঁচা মাছটাই খাবে ওরা। বড় ছেলে-মেয়ে দুটো তাদের একমাত্র চাচাকে মাছের মাথাটা কে খাবে অতি আগ্রহে জানতে চাইলে প্যাঁকালে আনমনা হয়ে 'হু উচ্চারণ' করলে তাদের বুক কেঁপে উঠে। ভাবে মাথাটা ছোটচাই খাবে। তারপর বলে-

> 'আচ্ছা ছোট-চা, আমাকে কাল থেকে 'যোগাড়' দিতে নিয়ে যাবে? উ-ই ও পাড়ার ভুলো ত আমার চেয়ে অনেক ছোট, সে রোজ দু'আনা করে আনে 'যোগাড়' দিয়ে। আচ্ছা ছোট-চা, দু'আনায় একটা মাছ পাওয়া যায় না?- তারপর তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাল থেকে আমার একা একটি মাছ! দেখব আর খাব! ঐ পটলিকে যদি একটা আঁশ ঠেকাই তবে আমার নাম গোরাই নয়, হুঁ হুঁ !

দারোগা গৃহিণীর বেলায় এঁটো করা আধ পোয়া দুধকে পানি আর মুরগীছানা ভোগ্য দুধ সহযোগে ক্ষীর রান্না এবং তাই দিয়ে সমগ্র পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টার পর শিশুদের সামাজিক 'বৌ পাল্যালো খেলা' ছোট চা'র হাতে মাছ দেখে সেই মাছের মুড়ো খাওয়া নিয়ে দরবার বসা এবং শুধু একটা মাছ খাওয়ার লোভে 'যোগাড়' দিতে যাবার আয়োজন নিম্নবিত্ত ছেলে-মেয়েদের এ চিত্র অতি জীবনঘনিষ্ঠ। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নজরুলের পক্ষেই এমন করে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। বলা যায় তিনি নিজেও ছিলেন দরিদ্র, নিষ্পেষিত সমাজের একজন। তাই হয়ত এত গভীর উপলব্ধিকে এত সহজ ও সাবলীলভাবে তুলে আনতে পেরেছেন তার সাহিত্যে।

জীবনের কথা, সমাজের কথা, সমাজের মানুষের কথা বলেছেন বিশ্বকবী রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের কোথাওই এমন চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। দারিদ্রকে পোস্টমর্টেমের মত ছিড়ে-খুঁড়ে জীবনের এমন আর্তনাদ রবীন্দ্র সাহিত্যের কোথাওই নেই। দরিদ্র, নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের এই যে জীবনচিত্র এ চিত্র অতি বাস্তব, জীবন ঘেঁষা। এখানে অতিরঞ্জিত বলে কিছু নেই।

অসম্প্রদায়িক মনোভাব। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্যাঁকালে ও কুর্শির প্রেমের ভেতর দিয়ে খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্যাঁকালে মুসলমান অপরদিকে কুর্শি খ্রীষ্টান। ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির আবিল চক্রান্তে - খ্রীষ্টান আর মুসলমানে কোন সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। এমনকি সহভোজন, স্পর্শ করাও দুই ধর্মের মাঝে প্রীতির পর্যায়ে পড়ে না। সেখানে প্যাঁকালে ও কুর্শিকে নজরুল টেনে নিয়েছেন কোন রকম সামাজিক অন্তরায়ের মুখোমুখি দাঁড় না করিয়েই।

শিল্প বিচারে এই ক্ষেত্রে নজরুলের অনেকটাই অসামঞ্জস্যতা চোখে পড়লেও বলা যায় নজরুল নিজের ব্যক্তিজীবনেও সব সাম্প্রদায়িক জীবন তথা চিন্তা-ভাবনার উর্দ্ধে অবস্থান করতেন সর্বদাই । তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এক হিন্দু রমণীর সাথে। সন্তানের নাম রেখেছেন কৃষ্ণ মোহাম্মদ। দুই ধর্মের দুই অবতারের নাম অনুসারে। 'সবার উপরে মানুষ সত্যি তাহার উপরে নাই'- এই অসাম্প্রদায়িক মানবতার জয়গান গেয়ে গেছেন তিনি কবিকণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত।

কাজেই বলা যায় কুর্শি এবং প্যাঁকালের প্রেম সামাজিক বিধি-নিষেধের মুখে থোরাই কেয়ার না করে কোন রকম বাঁধার সম্মুখীন না হয়েও পরিনতি লাভ করলেও তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু যে নিজ জীবনের ক্ষেত্রে নজরুল বাঁধন-হারা, বোহেমিয়ান প্রকৃতির

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন তাই নয় তাঁর গল্প, উপন্যাস, সমগ্র সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন বাঁধন- হারা, বোহেমিয়ান। পূর্বসূরীদের প্রথাগত কোন ধারণাকে অবলম্বন করে তিনি সাহিত্য রচনা করেননি। নিজের মত করে তৈরী করেছেন নিজের জগত। অবলীলায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টানকে এক করে ব্যবহার করেছেন নিজ সাহিত্য ভূবনে।

'মৃত্যুক্ষুধা' প্যাঁকালে প্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে কুর্শিকে বিয়ে করে যদিও এখানে প্যাঁকালের ধর্মান্তরণটি একান্তই অভাবের তাড়ণায় বলা যায়। এবং পরে প্যাঁকালে, কুর্শি উভয়ই পুনরায় কলমা পড়ে নিজ ধর্মে চলে আসে।

গ্রামীন ডাক্তাররা সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর ভিজিট নেয়ার পরিবর্তে কেমন করে শোষণ করে তার একটি পূর্ণচিত্র। শুধু তাই নয় তাদের লোলুপ দৃষ্টিরও প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। সেজ বৌ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে ছিটেন পাড়ার ন'করি ডাক্তার তাকে দেখতে আসে। ওরা গরীব, তিনি তাদের কাছ থেকে দয়া করে ভিজিট নেবেন না । কিন্তু শর্ত একটি, তার বৈঠকখানাটা বিনি পয়সায় চুনকাম করে দিতে হবে প্যাঁকালেকে। তিনি বললেন, বেশী সময় লাগবে না; মাত্র দিনতিনেক খাটলেই হয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেবের এই বিরাট মহানুভবতায় প্যাঁকালে চোখের জল মুছে কৃতজ্ঞতার সাথে রাজী হয়।

ন'করি ডাক্তার এতটুকুতেই ছেড়ে দেবার পাত্র নন, এই না খাওয়া পরিবারটিকে। তিনিও আর ভিজিট নিচ্ছেন না। এত বড় দয়া যে দেখাচ্ছেন, এইটাইতো ওদের সাত পুরুষের কপাল। উল্লেখ্য, এই সাত পুরুষের কপাল শুধু প্যাঁকালেদের নয়, আমাদের সমাজের নিম্নবিত্তদের এটি নিত্যনৈমিত্তিক কপাল। অসুখ হলেই তারা এ কপাল জোড়ে কৃপা লাভ করেন ডাক্তারদের। ডাক্তার সেজ বৌকে দেখে চলে যাবার সময় দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে বললেন,

> হ্যাঁ রে, মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ি? একটা ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার।

প্যাঁকালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের এই চাওয়াটাতেই অত্যন্ত বাধিত হয়ে ঘরে জমানো গোটা আটেক ডিম এনে ডাক্তারের হাতে তুলে দিল। যা বিক্রি করে ওদের এক বেলার খাবার যোগাড়ের জন্য জমিয়ে রাখা হচ্ছিল একটা একটা করে। ডাক্তার মহানন্দে তার ঝোলা থেকে স্টেথিস্কোপটা বের করে সেখানে ডিমগুলি ফেলে দিলেন। রোগি দেখতে এসে মেজ-বৌ এর রুপের দহণে ডাক্তার নিজেও গেলেন রুগী হয়ে ফিরে। তার বর্ণনা রয়েছে,

> মেজ-বৌর শূন্য নিটোল হাত দুটি, এক জোড়া সাদা পায়রার মত পা আর ঘোমটার অবকাশ সোনার বলয়ের মত ঠোঁটসহ আধখানি চিবুক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু এতেই তার নাড়ী একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের রোগীর মতই দ্রুত চলছিল।
> ডাক্তার এখানে মেজ-বৌয়ের রুপেই শুধু আক্রান্ত না কি দুর্বল সুন্দরী নারীর প্রতি সবল পুরুষের এ সহজাত লোলুপতার প্রকাশ তার স্পষ্টতা মেলেনি। তবে ডাক্তারের আচরণে তার লোলুপ দৃষ্টি-ভঙ্গির বহি:প্রকাশই ঘটিয়েছে।

মিশনারীদের ধর্মপ্রচার। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া। যদিও তা উপন্যাসের পটভূমি তৈরী করেনি। খ্রীষ্টান মিশনারীদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপটের আলোকে। নজরুল ইসলাম একজন গবেষণামনস্ক সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি তদন্ত করে অত্যন্ত কৌশলে সাবলীল ভাষায় আলোচ্য উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। ঔপনিবেশ পর্যায়ে বাংলার এক শ্রেণীর মানুষের রোগ-শোক, ক্ষুধা, দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা কিভাবে এদেশের মানুষদের খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে, তার একটা নিখুঁত চিত্র নজরুল এ উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে ইংরেজ এদেশে নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে চেয়েছে মূলতঃ। নজরুলের সমকালীন বা তার পূর্বের হিন্দু মুসলমান লেখকগণ বিষয়টিকে বুঝেও এড়িয়ে গেলে নজরুল তার চির উন্নত কণ্ঠ দাবিয়ে রাখতে পারেননি।

নবম পরিচ্ছেদে প্যাঁকালের মার বিধবা সেজ-বৌ এর অসুখের অজুহাতে মিশনারীর পাদরী সাহেব এই দরিদ্র পরিবারটিতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, মিশনারীরা তাদের মিশন সফলের জন্য ব্যবহার করত সমাজের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর রোগ, শোক ও দারিদ্রে নিষ্পেষিত হিন্দু-মুসলমান পরিবারের উপর। গায়ে পরেই তারা নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করত এদের এবং এরই মাঝে অত্যন্ত কৌশলে টেনে নিত নিজ ধর্মের ছায়ায়। প্যাঁকালেদের সংসারে এরা প্রবেশ করে এভাবে,

> ''হঠাৎ একদিন একপাল ছেলেমেয়ে চীৎকার করতে করতে ঘরে এসে বললে'', ওগো, তোমাদের বাড়িতে সায়েব আর মেম আসছে। বাড়ীশুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! সত্যি সত্যিই একজন পাদরী সাহেব সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে ঘরে ঢুকল এসে। ..... সায়েব বাংলা ভালই বলতে পারে। বললে, তোমরা ভয় করবে না। হামি তোমাদিগের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাদের কে পীরিট আছে, টাহাকে ঔষড দিবে! প্যাঁকালের মা একটু মুশকিলেই পড়ল প্রথমে। পরে আমতা আমতা করে বললে, খোদা তোমার ভাল করবেন সায়েব । ঐ আমার বৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ, যদি ভাল করতে পার । কেনা হয়ে থাকব তাহলে? সায়েব খুশী হয়ে বললে, 'কোনো চিন্টা নাই। যীশু ভালো করিয়া ডেবে। যীশুকে প্রারঠনা করো'। তারপর' এগিয়ে মাটিতেই বসে পড়ে শিশুকে পরীক্ষা করতে লাগল।..... নার্স সেজ বৌকে পরীক্ষা করতে লাগল। ..... তারপর প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতকগুলো ওষুধ দিয়ে খাওয়াবার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেল । .... মেম সায়েব যাবার বেলায় এক টাকা দিয়ে গেছে সেজ বৌর পথ্যি কিনতে।

এই পরিবারটিতে মিশনারীরা তাদের ভালমানুষী আচরণ দিয়ে প্রথম দিনেই কতটা প্রভাব ফেলে তারা চলে যাবার পর মেঝ বৌ এর উক্তিতেই এর সত্যতা মেলে। মেঝ বৌ কাঁদতে কাঁদতে বলে ,

> সেজ-বৌর যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙ্গুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না! শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে; গেঁয়াত কুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়!
> শাশুড়ীও কেঁদে বলে, 'যা বলেছিস মা'।

মিশনারীদের চিকিৎসাতে সেঝ-বৌ এবং তার ছেলেকেও বাঁচানো গেল না কিন্তু এরি মাঝে মিস জোন্স গায়ে পড়েই একটা বাড়াবাড়ি রকমের সম্পর্ক গড়ে তুলল মেজ বৌ এর সাথে। মেম সাহেবের অস্বাভাবিক ভালমানুষী আচরণে মেজবৌও তাকে আর মেম সায়েব বলে অতিরিক্ত সংকোচের ভাব করে না। তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পরিণত না হলেও যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠেছে। মেজ-বৌকে নিজের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট এবং স্বাভাবিক করে তুলে মেম সায়েব একদিন হঠাৎ বলেই বসল

Dhaka University Institutional Repository

ডেখো, তোমার মতো বুডটিমটি মেয়ে লেখাপড়া শিখলে অনেক কাজ করতে পারে। টোমাকে দেখে এট লোভ হয় লেখাপড়া শেখাবার।

মেজ-বৌ হঠাৎ মেমের মুখের থেকে যেন কথা কেড়ে নিয়েই বলে উঠল, 'সত্যি মিসি বাবা! আমারো এত সাধ যায় লেখাপড়া শিখতে! শেখাবে আমায়? আমার আর কিছু ভাল লাগে না ছাই এ বাড়ীঘর!

মিস জোন্স খুশীতে মেজ-বৌর হাত চেপে ধরে বলে উঠল, আজই রাজী। বরো ডুখখু পাচ্ছো তুমি, মনও খুব খারাপ যাচ্ছে তোমার এখন, লেখাপড়া শিখলে তোমার মন এসব ভুলে থাকবে।

মিস জোন্সের শেষের উক্তি থেকে মনে হয় সে যেন মেজ-বৌ এর এই দুর্বলতার উক্তিটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল এতদিন। আজ যেন একেবারে হাতে চাঁদ পেয়ে গেছে সে। মেজ-বৌ তার ছেলেমেয়ের কি হবে জানতে চাইলে মিস জোন্স দ্বিধাহীনভাবে ওদেরকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য বলে এবং ওদের খাওয়া-দাওয়ার নিশ্চিন্ততার আশ্বাসও দেয়। সেই আশ্বাসেও মেজ-বৌ দ্বিধান্বীত হয়ে চিন্তাযুক্তভাবে থাকলে মিস জোন্স তা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে মেজ-বৌ তার সামাজিক অবস্থান, পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা সবকিছু নিয়ে ভাবনায় পড়েছে। সুচতুরা ইংরেজ মেয়ে তখন নিজ থেকেই আরো দয়াপরবশ এবং মহত্বের বাণী ছুড়ে দিয়ে অতি কোমল কণ্ঠে বলতে লাগল ,

আমি টোমার মনের কঠা বুঝেছে। টোমাকে একেবারে যেটে হবেনা সেখানে । ক্রীশ্চানও হ'টে হবে না। তুমি শুধু রোজ সকালে একবার করে যাবে। আবার ডুপুরে চলে আসবে।

মিশনারীরা এভাবেই আমাদের সমাজের দুর্বল মানুষগুলোর দুর্বলতায় কোমলতার ছোঁয়া মিশিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। তারপর আস্তে আস্তে ধর্মান্তরিত করে ফেলত। কিন্তু নিজেদেরকে কখনোই দোষী রূপে প্রমাণ করার কোন ফাঁক-ফোঁকর রাখত না। সবাই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে এটাই প্রকাশ্যে নিজ ধর্মত্যাগকারীদের মুখ দিয়ে অবলীলায় প্রকাশ করে ফেলত এবং এটা মেজ-বৌ এর চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখক দেখাতে চেয়েছেন খুব স্পষ্ট করে। উনিশ অনুচ্ছেদে মেজ-বৌ এর মুখ দিয়েই তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে।

মিস জোন্সের অস্বাভাবিক দয়াশীল এবং ভালমানুষী আচরণে মেজ-বৌ প্রথমে একদিন, দু'দিন করে যেত মিশনারীদের ওখানে। এবং একপর্যায়ে সে তার ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে একবারেই চলে যায় মিশনারীতে। এ নিয়ে চাঁদ-সড়কে ভীষণ একটা হৈ-চৈ শুরু হলে আনসার এগিয়ে আসে খ্রীষ্টানদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে। সে যায় মিশনারীদের গীর্জায়। মেজ-বৌ এর সাথে দেখা করার জন্য এবং পাদরী সাহেবকে উদ্ধত কণ্ঠে বলে ,

দেখ পাদরী সাহেব, আমি গেঁয়ো মোল্লা-মৌলবী নই যে, ধমকে তাড়িয়ে দেবে! মেজ-বৌ যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকে, আমি কিচ্ছু বলব না। আর যদি অন্যকোনো উপায়ে ওর সর্বনাশ করে থাক, তা'হলে এই নিয়ে দেশময় একটা হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেব।

পাদরী সাহেব তখন আনসারের বাণীতে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল

নো মিস্টার আপনে যঠেচ্ছা প্রশ্ন করেন আমাদের ভোগ্নি হেলেনকে, আঠাট ভুটপুর্ব মেজ-বৌকে। ডেখিবেন, টাহাকে স্বয়ং ঈশ্বর সটপঠে ডাকিয়াছেন। আমরা কেহ নয়!

Dhaka University Institutional Repository

আনসার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই মিস জোন্সের সাথে মেজ-বৌ ওরফে হেলেন ঘরে ঢুকে অতঃপর মিস জোন্সের সাথে সৌজন্যমূলক দু'চারটা কথা সারার পর আনসার সরাসরি মেজ-বৌ এর কাছে জানতে চাইল।

আচ্ছা বলুন ত, আপনার হঠাৎ খ্রীষ্টান হবার কারণ কি?
মেজবৌ- আমি ত হঠাৎ খৃষ্টান হইনি।
আনসার- তার মানে আপনি একটু একটু করে খ্রীষ্টান হয়েছেন?
মেজবৌ- জি না আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রীষ্টান করেছেন।

মেজ-বৌ এর এই স্ব-ঘাষিত স্বীকারোক্তিতে কোথাওই প্রমাণ মেলে না মিশনারীরা তাকে খ্রীষ্টান বানিয়েছে বা খ্রীষ্টান হতে বাধ্য করেছে।

উত্তর উপনিবেশিক (Postcolonial) দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্যে 'এলিজাবেথিয়ান এইজ' নামে একটা যুগের সাহিত্যকে নামকরণ করা হয়েছে শাসকগোষ্ঠির নামানুসারে। শাসকগোষ্ঠির নামে কেন এই নামকরণ? এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায় , ইউরোপে একটা সময় দেখা গেল মানুষ আর বাইবেল শুনতে গির্জায় যাচ্ছে না। তখন সমকালীন ইংরেজ শাসকগণ ভাবলেন যে, মানুষ যখন গির্জায় গিয়ে বাইবেল শুনছে না, তখন বিকল্প পথ অবলম্বণ করতে হবে। অর্থাৎ বাইবেলের পাঠ তারা মিশিয়ে দিলেন সাহিত্যে। কারণ জনজীবনে বাইবেলের পাঠ যত গভীর ও স্থায়ী প্রভাব থাকবে, ততবেশী প্রভুত্ব থাকবে শাসকগোষ্ঠির।

ঔপনিবেশ স্থাপনের প্রথম দিকে মিশনারীদের কার্যক্রমও সেই সূত্রেই প্রবলতর ছিল। তাদের ধারণা ছিল 'এলিজাবেথিয়ান এইজ' সময়ের শাসকগোষ্ঠির মতই। উইলিয়াম কেরী এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কথা বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের সাথে জড়িত। কৃষ্ণনগরসহ বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ২৫টি প্রধান প্রধান মিশনারী কেন্দ্র খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। এর মধ্যে কৃষ্ণনগর ব্যাপটিস্ট মিশনের কার্যক্রমের রেখাপাত ঘটে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছয়ে পড়া, অশিক্ষিত, রোগে-শোকে পীড়িত জনগোষ্ঠির উপরই মূলতঃ এই মিশনারীদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে মিশনারীর লোকেরা অর্থ, চিকিৎসা, সেবা, সহানুভূতিসহ তাদের অত্যাধিক ভালমানুষী আচরণ দিয়ে প্রথমে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করত। তারপর ধীরে ধীরে তাদের ধর্মান্তরণ করতে বাধ্য করতো। সুস্থ, সুন্দর এবং পেট ভরে খেতে পারার লোভে এই দুঃখী মানুষেরা কখন যে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে হয়তবা তা টেরও পেতনা।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস রচনাকালে নজরুল কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে এক খ্রীষ্টান মহিলার বাড়িতেই ভাড়াটে হিসাবে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই খুব কাছে থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন মিশনারী লোকদের আচরণ, ধর্মান্তকরণের সূক্ষ্ম কলাকৌশল। এবং এই পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ তা তুলে ধরেছেন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে।

মৌলভীদের স্বেচ্ছাচারিতা। সমাজের দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর উপর মোল্লা তথা মৌলভীরা কেমন করে তাদের স্ব-স্বীকৃত রায় চাপিয়ে দিয়ে হয়রানির শিকার করত, নজরুল তাও এখানে তুলে এনেছেন অত্যন্ত বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে। যুগে যুগে মৌলভীরা সমাজে অনাচার রোধের নামে চাপিয়ে দিয়েছে তাদের নিজস্ব মতামত। কখনো কোন নিঃস্ব পরিবারকে করে তুলছে আরো নিঃস্ব, আবার কখনো অনাচার রোধের নামে ফতোয়া

Dhaka University Institutional Repository

জারী করে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে কোন নিষ্পাপ নারীকে। ইতিহাসে এমন উদাহরণ আছে ভুরি ভুরি।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের উনিশ অনুচ্ছেদে খুব অল্প পরিসরে সমাজে মৌলভীদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা যায়, খুব অল্প বক্তব্য নিয়ে এই সংকট উপস্থাপিত হলেও বৃহৎ একটি অর্থ বহন করে এসেছে বক্তব্যটি। মেজ-বৌ হঠাৎ করেই তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে গেলে এ নিয়ে এলাকায় বেশ একটি হৈ চৈ পড়ে যায়। প্যাঁকালের মার আর্ত-আহাজারিতে সমস্ত পাড়ার আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতিতে নাসারাদের বজ্জাতি এবং প্যাঁকালের মার পরিবারকে সমাজে দায়মুক্ত করার অভিপ্রায়ে নিজ থেকেই এগিয়ে আসে পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব। তার বর্ণনা রয়েছে এভাবে,

> পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ী মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ঈমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ মেয়েতে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কালই মওলানা হযরত পীর গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানী সাহেবকে এই গোমরাহ বেদীনদের নসিহত ও দরকার হলে 'বহস' করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ীর ছাগল কয়টা বিক্রী করে পনর টাকা যোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।

আনসার মেজ-বৌ এর কথা আগেই শুনেছিল তার বোন বুঁচি'র কাছে। তাই মৌলানাদের জলসার রায় শোনার জন্য অতি উৎসাহী হয়েই গিয়েছিল সেখানে। শেষে মৌলভীদের এই রায় শোনার পর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে গেল। লতিফা সভার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে তিক্তস্বরে আনসার বলল,

> মেঝ-বৌ হল খ্রীষ্টান, লাভ হল পীর আর মওলানা সাহেবদের। আর মরার ওপর বাঁড়ার ঘা- বেচারী প্যাঁকালের মার কপাল ত এমনিই পুড়েছে, যেটুকু বাকী ছিল মোল্লাজী তাও শেষ করে গেলেন। এরপরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালেরা ঘরগোষ্ঠী মিলে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে বুঁচি, তাহলে আমি কিছু বলব না। একটু থেমে আনসার বিষাদঘন কণ্ঠে বলে উঠল, বুঝলি বুঁচি, প্যাঁকালের মা এত কেঁদে বেড়িয়েছে আজ, কিন্তু আজ মৌলুদ শরীফ হয়ে যাবার পর এবং পাড়ার মোল্লা মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তার কান্না একেবারে থেমে গেছে। আহা বেচারী! ঐ ছাগল ক'টাই ত ওর সম্বল- তাই তাকে কাল বিক্রী করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা-মোড়লদের সম্পর্কে আনসারের মুখ থেকে এসব বক্তব্য বের হয়ে আসার পর এ সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য করা অর্থহীন। এখানে নজরুল একাধারে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর মত সমাজের সমস্যা তুলে ধরে তার মনোবিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের এসব সামাজিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা শেষে খুব স্পষ্টভাবেই বলা যায় উপন্যাসটি তার মনোজগতের বিশ্লেষণেরই সফল প্রকাশ। সমাজকে তিনি যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই তিনি উপস্থাপন করেছেন এই উপন্যাসে। ছোট ছোট বক্তব্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন গভীর এবং বৃহৎ অর্থকে, বৃহৎ সমস্যাকে, বৃহৎ উপলব্ধিকে। এই উপন্যাসে নজরুল একেবারেই আবেগ বিবর্জিত।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে নানা সমস্যার অবতাড়ণা করেছেন তিনি এখানে একটি মাত্র পরিবারের মধ্য দিয়ে।

সাম্যবাদীতা। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে চৌদ্দ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্যাকালের মার পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক টানা-পোড়েনের একটানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রাজনীতির কোন ছিটে-ফোঁটার সন্ধানও মেলে না। প্রচন্ড অর্থনৈতিক চাপের মুখে একাধিক সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে কাহিনী। যা সমকালীন দেশ-কাল ও সমাজের আবর্তে আবর্তিত হয়েছে। পনর অনুচ্ছেদে এসে কোন রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই উপন্যাসে প্রবেশ করে রাজনীতি। যা উপন্যাসকে দ্বি-খন্ডিত করে ফেলে। আনসার নামের এক প্রচন্ড প্রতিবাদী কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করান হয় রাজনীতিকে। এবং আনসার চরিত্রের মধ্যে দিয়েই তা এককভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় পরিণতির দিকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই শ্রমশক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল বহুপূর্বে, বোম্বাইয়ের লোখান্ডের 'দীনবন্ধু' ও বাংলার শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকা শ্রমিকদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে কারখানায় কারখানায় নানা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এরই মধ্যে রুশ বিপ্লবে শ্রমিক শক্তির বিজয়ে সাম্যবাদী নবভাবের বন্যা বয়ে এল, শ্রমিক শক্তির সামগ্রিক সংহতির জন্যে প্রতিষ্ঠিত হল 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' । এই সাম্যবাদীতার শপথ নিয়ে উপন্যাসে আনসার চরিত্রের আগমন । বিপ্লবী নেতা হিসাবেই যে আনসার পরের অংশটুকুতে করেছে অবাধ বিচরণ।

উপন্যাসে আনসারের আগমন ঘটে এভাবে ,

> চাঁদ- সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। লক্ষীছাড়া মত চেহারার লম্বা-চওড়া একজন মুসলমান যুবককে কোত্থেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল। .... যুবকের গায়ে খেলাফতী ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়ল ওঠে। খদ্দরেরই জামা-কাপড় কিন্তু এত মোটা যে, বাস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মত টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি ক্রস। তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল, হাতে দরবেশী ধরণের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি । সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট - প্যান্ট। পায়ে নৌকোর মত এক জোড়া বিরাট বুট, চ'ড়ে অনায়াসে নদী পাড় হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা তেমনি নাক-চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে তৈরী- গ্রীক ভাস্করের এ্যাপোলো মুর্তির মত নিখুঁত সুন্দর।

এই যুবকই হচ্ছে সাম্যবাদী বিপ্লবী নেতা আনসার। তার পোষাকের বর্ণনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, সে খেলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত কেউ। 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল' প্রতিকৃতিযুক্ত তরবারি ক্রস তার টুপিতে যুক্ত রয়েছে। এই থেকে বোঝা যায় সে অসহযোগ আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিল। কারণ খেলাফত আন্দোলন শুরু হবার পর গান্ধীজী ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলমান এবং হিন্দুদের সমন্বয়ে একই সাথে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার এক বিশেষ অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই অধিবেশনেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যুবক আনসার একাধারে অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের কর্মী। এ তার পোষাক এবং সৈনিকদের 'ফেটিগ ক্যাপের' মত টুপির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এই যুবকের সাথে কৃষ্ণনগরবাসী বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী নজরুলের সাথে অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যুবকের বাহ্যিক গড়নের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে "শরীরের রং যেমন ফরসা, তেমনি নাক চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যে মাপ করে তৈরী গ্রীক ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্তির মত নিখুঁত সুন্দর"। এই বর্ণনার সাথেও নজরুলের বাহ্যিক গড়নের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের বিপ্লবী নেতার পোষাক পড়ে আনসারের উপন্যাসে আগমন ঘটলেও কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করার কাজেই ব্যপৃত থাকে সে। পোষাক পাল্টানোর পর আর কোথাওই অসহযোগ কিংবা খেলফতী রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটেনি।

সে যে রাজনৈতিক অপরাধী এবং কৃষ্ণনগরে এসেছে রজনৈতিক মত বদল করে নতুন রাজীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তা তার জবানবন্দীতেই প্রকাশ পায় এভাবে 'বোল অনুচ্ছেদে' লতিফা ওরফে বুঁচি ১০৯ নম্বর কি জানতে চাইলে আনসার উত্তর দিয়েছিল,

> ওসব বুঝবিনে তোরা, আমাদের রাজনৈতিক অপরাধীদের একটা করে নম্বর আছে- সমস্ত সিআইডি পুলিশ অফিসারের কাছে একটা করে লিষ্ট থাকে। পাছে অন্য কেউ জানতে পারে তাই আমাদের নাম না নিয়ে নম্বরটার উল্লেখ করে চিঠিপত্র লেখে বা তার করে

সতেরো অনুচ্ছেদে তার কৃষ্ণনগর আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে,

> আমি এখানে কেন এসেছি জানিস? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে। আমি এখন .....। ..... একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিক সংঘের একটা করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়।

অতঃপর সাম্যবাদী চেতনায় উজ্জীবীত হয়ে বিশ্বমানবতা ও শাশ্বত সত্যের পথে আনসার সমাজের নিম্নশ্রেণীর কুলি, মজুর, কৃষক, মেথরদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হলো। দু'তিন দিন পরই দেখা গেলো,

> আনসার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে একটা রীতিমত হুলুস্থুল বাঁধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক ক্ষেপাতে। সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যেও এনিয়ে কানাঘুষা চলেছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি এমন কি কংগ্রেস ওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেদিকে আনসারের ভ্রুক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নজরুল জীবনী থেকে জানা যায় তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন রাজনীতির সাথে সক্রিয় জড়িত ছিলেন। তিনি সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের দল গড়েন 'কৃষক শ্রমিক দল' নামে। রুশ বিপ্লবের প্রতি প্রচন্ড সমর্থন ছিল নজরুলের। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯১৭ সালে শুরু হল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। পুঁজিবাদীও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মুক্ত করে একটি নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম ঘোষণা করেছিল এই বিপ্লব। প্রমাণ করেছিল ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ শাশ্বত নয়, অজেয়ও নয়। প্রমাণ করেছিল ধনতন্ত্রের অবক্ষয় সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী এবং এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করতে যাচ্ছে, যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক দেশের জনগণ, কোন মুনাফালোলুপ ব্যক্তি বিশেষ নয়।

এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ পেল মুক্তির নতুন পথের সন্ধান। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কবলিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মনে এই বিপ্লব গভীর রেখাপাত করলো এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করলো। প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পতন এবং সর্বহারার একনায়কত্বে রাশিয়ার শ্রমিক কৃষককে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তিই দিলনা, রুশ অক্টোবর বিপ্লব জাতিগত শোষণের অবসানও ঘোষণা করল। একটি দেশের এক জাতি কর্তৃক আরেক জাতির শোষণ এক ভাষাভাষী জনগণের সাথে অন্য ভাষাভাষী জনগণের বিরোধ অবলুপ্ত হল এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এশিয়ার উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান প্রভৃতি নিপীড়িত, পিছিয়ে পড়া এবং মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন রাজ্যগুলো পেল এক অপূর্ব মুক্তির স্বাদ। ঘোষিত হলো জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের অর্থ রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মত একটা বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্ব। বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেনীর কোন দোদুল্যমানতা নেই, নেই কোন পিছুটান বা আপোষমুখীন মনোভাব। যা উপন্যাসের বিপ্লবী বলশেভিক নেতা আনসারের মধ্যে জ্বাজল্যমান।

রাশিয়ার এই বলশেভিক বিপ্লবের প্রতি নজরুলেরও সমর্থন ছিল প্রচন্ড। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সময় প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্য ভারত থেকে ট্রান্সককেশিয়ায় প্রেরিত বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু সৈনিক দলত্যাগ করে লালফৌজে যোগদান করেন, সে সংবাদ রুশ বিপ্লবের মতই সেনাবাহিনীর বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে নজরুলের কানে পৌছে গিয়েছিল। এবং এ ঘটনা থেকেই করাচী সেনানিবাসে বসেই যে নজরুল 'ব্যাথার দান' লিখেছিলেন সে মত পোষণ করা যায় দ্বিধাহীনভাবে। বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী ছেড়ে ভারতীয় সেনাদের লালফৌজে যোগদানের সংবাদ থেকেই যে 'ব্যথার দানের' দারা ও সয়ফুল মুলক এর লালফৌজে যোগদানের ঘটনা ঘটেছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। রুশ বিপ্লবের সংবাদে সেনানিবাসে থেকে নজরুল যে কতটা উদ্দীপ্ত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় নজরুলের সহসৈনিক জমাদার শম্ভু রায়ের একটি পত্র থেকে। তিনি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন,

> নজরুল তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করত তাদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে, অবশ্য এই রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তাঁর বন্ধুদের করত। কিন্তু ঐদিন যখন সন্ধ্যার পর তাঁর ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু তাঁর অরগ্যান মাষ্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্যরকমের জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। ..... নজরুল সেই দিন যে সব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান, বাজনা, প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল উচ্ছসিত হয়ে উঠে এবং ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। .....

কাজেই এটা খুব স্পষ্ট করে বোঝা যায় আনসার চরিত্রটি নজরুলের সেই রাজনৈতিক প্রিয়তা এবং আদর্শেরই বাস্তব রূপায়ন। সমাজের নিপীড়িত মানুষের প্রতি তিনিও আনসারের মতই ছিলেন সদা প্রতিবাদী কণ্ঠ। আনসার সম্পর্ক লতিফার একটি উক্তিকে এক্ষেত্রে নজরুলের চরিত্রের সাথেও একাত্ত করে ভাবা যায় । উক্তিটি হচ্ছে

তার এই ছন্নছাড়া ভাইটি সর্বহারা ভিখারীদের জন্যই আজ পথের ভিখারী। তাকে কাঙ্গাল করেছে এই কাঙ্গালদেরই বেদনা।

উনিশ অনুচ্ছেদে দরিদ্র নিম্নবিত্ত অধিকারহীন মানুষ সর্ম্পকে বুঁচির উদ্দেশ্যে আনসারের এক দীর্ঘ বক্তব্য পাওয়া যায় -

সত্যিই রে বুঁচি, ক্ষুধিত মানুষ- অভাব- পীড়িত মানুষের মত সকল দিক দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়! ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে। দু'মুঠো অন্যের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন। তুই বুঝবিনে বুঁচি, ওদের অভাব কত অতল অসীম, ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়। আমি দেখেছি ঐ হতভাগ্যদের দুর্দশার নিত্যকার ঘটনা- তাই ত আমার মুখের অন্ন এমন তেঁতো হয়ে উঠেছে। এক মুঠো ডাল-মাখা ভাত যখন খাই তখন গলার ওধারে যেন আর পেরোতে চায় না, আটকে যায়। মনে হয় আকাশের ঐ তারার মতই ক্ষুধিত চোখ মেলে কোটি কোটি নিরন্ন নর-নারী আমার ঐ এক গ্রাস ভাতের দিকে চেয়ে আছে। ওদের দুঃখ তুই বুঝবিনে বুঁচি। দু-মুঠো অন্নের জন্য ওরা মেথর হয়ে তোদের ঘরে-বাইরের সকল রকম ময়লা নোংরা মাথায় করে ঘয়ে নিয়ে যায়। ধাঙ্গর হয়ে ভোর না হতেই তোদের গায়ের ধুলো দু-হাত দিয়ে পরিস্কার করে পথে পথে। তাদের কথা বলিসনে বুঁচি অন্তত -ওদের দোষ দিসনে আমার কাছে কখনো! তুই ত মা, তুই কি বিশ্বাস করবি যে, ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে? নিজের ছেলে-মেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রী করছে দু- মুঠো অন্নের জন্য? খোদা তোকে সুখে রাখুন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে কী জ্বালা তা যদি একটা দিনের জন্যও বুঝতিস তা হলে পৃথিবীর কোন পাপীকেই ঘৃণা করতে পারতিসনে।

এই দীর্ঘ বক্তব্য শেষে মনে হয় এ নজরুলেরই আর্তনাদ। এটা তার সাম্যবাদী চেতনার পূর্ণ ফতিফলন। নজরুল যে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তারও প্রধান কারন তাঁর এই সাম্যবাদী চেতনা। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা কেবল শহর অঞ্চল বা শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমবদ্ধ না রেখে মফঃস্বলে কৃষক ও জেলেদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করেন। এই সময়েই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক সহকর্মী হেমন্তকুমার সরকারও তাঁর সাথে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং জেলে ও চাষীদের অনেক সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন। 'মজুর স্বরাজ পার্টি' বা 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল' নামে এই পার্টি গঠনের সাথে সাথে প্রকাশ করে সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙ্গল'। 'লাঙ্গলের' পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক ছিলেন মনিভূষণ মুখোপাধ্যায়। চন্ডীদাসের ''শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'' -এই অমর বাণীকে শুরুতেই স্থান দিয়ে পূর্ণ সাম্যবাদী ভাবধারায় প্রকাশিত হত 'লাঙ্গল'। 'লাঙ্গলে' মজুর স্বরাজ পার্টি বা শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের নিয়মাবলী ও গঠন প্রণালী প্রকাশিত হয় নিম্নরূপ ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

১। উদ্দেশ্য ঃ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এ দলের উদ্দেশ্য।

২। উপায় ঃ নিরস্ত্রগণ আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগ উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।

৩। কর্মনীতি ও সংকল্প ঃ দেশের শতকরা আশিজন যাহারা সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সংঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া নিজের সমতার এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের সতেরো পরিচ্ছেদে আনসার যখন বলেন 'এখানে একটা শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলতে এসেছি' এবং পরে এই শ্রমিক সংঘের যে কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ হয় তার সাথে 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের' কাজকর্ম ও নিয়মাবলীর কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে সমাজের শোষিত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে আনসার যে সোচ্চার কণ্ঠ মেলে ধরেন এ কণ্ঠ মেলে ধরেছিলেন নজরুলও। সাম্যবাদীতাই ছিল তার নিজ দলের প্রধান সুর। যে সুর আনসারের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে বারবার।

আনসারের এই শ্রমিক সংঘের কাজ, ধ্যান, ধারণা সমাজের নিচু স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার জন্য সর্বদাই সে তাদের মাঝে মিশে থাকলে তা শোষন শ্রেণীর ভীত কাঁপিয়ে তোলে। ফলে গ্রেফতার হয় আনসার। আনসারের গ্রেফতারের সংবাদে হৈ-চৈ পড়ে যায় চারিদিকে। একুশ অনুচ্ছেদে রয়েছে ;

আনসারকে ধরার জন্য সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ সারা রাত্রি ধরে বাগানের গাছে, নাজির সাহেবের বাড়ীর আনাচে-কানাচে পাহাড়া দিচ্ছিল, ভোর না হতেই তারা ঘুমন্ত আনসারকে বন্দী করল।
শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, নাজির সাহেবের শালা আনসার রাশিয়ার বলশেভিক চর ও বিপ্লবী নেতা। সে ছেলেদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল।

আনসার গ্রেফতারের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে যাদের মাঝে সে তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে আনার গোপন সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তারা দলে দলে নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে আসতে লাগল। পুলিশের বাঁধাকে তারা কোন রকম গ্রাহ্যই করল না। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে ভয় ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে ফাঁকা গুলিও করল কিন্তু এক পাও নড়ল না তারা। এর বর্ণনা রয়েছে এভাবে ;

আনসার ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং সবাই জানতে পারল যে, আনসার এখনও বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় আছে। দলে দলে মেথর, কুলি, গাড়োয়ান, কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবের বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগলো। পুলিশের মার-গুঁতো-চাবুক-লাথিতে ভ্রুক্ষেপ না করে তারা নাজির সাহেবের ঘর ঘিরে ফেললো। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু'একটা ফাঁকা আওয়াজও করলো বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। ওরি মধ্যে একটা বৃদ্ধ মেথর চীৎকার করে উঠল, 'হুজুর' আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।

দুঃখী এই মানুষগুলোর হৃদয়ের কতটা গভীরে পৌঁছুতে পেরেছিল আনসার তা বৃদ্ধের এই উক্তিটি থেকেই প্রমাণিত হয়। তাদের বুক ফাঁটা আর্তনাদে চারদিকের বাতাস

Dhaka University Institutional Repository

ভারী হয়ে উঠে। বিক্ষুব্ধ জনতার ক্রন্দনরত কাতর ধ্বনিকে মনে হতে লাগল সে যেন বিক্ষুব্ধ গণ-দেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুংকার। আনসারের চোখে পানি এল। সে জনতার উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বলল "আমি জানি তোমাদের জয় হবে। তোমাদের কণ্ঠে স্বাধীন মানবাত্মার শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।" সমবেত জনতাকে কোন অবস্থাতেই পুলিশ সরাতে না পেরে শেষে আনসারেরই কাছে সহযোগীতা কামনা করল। গুলি করার ভয়ও দেখাল। আনসার ওদের ভয়কে উপহাসের মত ছুঁড়ে ফেলে বলল,

> আমরা গুলীখোরের জাত। ওটা ধাঁতে সয়ে গেছে।

তারপর জনতাকে হাসিমুখে নমস্কার করে বলল ,

> তোমরা ফিরে যাও। ভয় নেই আমার ফাঁসি হবে না আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের মাঝে। ..... বন্ধুগণ! আমার বিদায়কালে তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবী কিছুতেই ছেড়ো না! তোমাদেরও হয়ত আমার মত ক'রেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলী খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্য স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই , তার জন্য দুঃখ করো না। যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্রইবা নাই বলব কেন? কোচোয়ান! তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে -পশুকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবেনা! রাজমিস্ত্রী! তোমার হাতের কন্নিক দিয়ে ফুটগজ দিয়ে এত বাড়ী-ইমারত তৈরী করতে পারলে, বুনো প্রকৃতিকে রাজলক্ষীর সাজে সাজালে, পীড়িত মানুষের নিশ্চিন্তে বাস করার স্বর্গ তোমরাই রচে তুলতে পারবে। আমার ঝাড়ুদার, মেথর ভাইরা, তোমরাই ত নিজেদের অশুচি অস্পৃশ্য করে পৃথিবীর শুচিতা রক্ষা করছ, নিজে সমস্ত দুষিত বাষ্প গ্রহণ করে, আয়ুক্ষয় করে আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ, আমাদের চারপাশের বাতাসকে নিষ্কলুষ করে রেখেছ! তোমরা এত ময়লাই যদি পরিষ্কার করতে পারলে তা'হলে এই ময়লা মনের ময়লা মানুষগুলোকে কি শুচি করতে পারবে না? তোমাদের মত ত্যাগী করতে পারবে না? তোমাদের ঐ ঝাড়ু দিয়ে ওদের বিষ ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না? তুমি চাষা? তুমি যে হাল দিয়ে মাটির বুকে ফুলের ফসলের মেলা বসাও, সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্বর হৃদয় মানুষের মনে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে পারবে না?

আনসার এখানে অধিকার আদায়ের জন্য কোচোয়ানের চাবুক, রাজমিস্ত্রীর কন্নিক, ঝাড়ুদারের ঝাড়ু, চাষীর লাঙ্গলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ করে উচু নীচু ভেঙ্গে ফেলার আহবান জানিয়েছেন সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনতাকে। ওসব ব্যবহারের বিভিন্ন দিকও উল্লেখ করেছেন। সাম্যবাদীতার সুরে সুরে ধ্বনিত মুখরিত করে চারদিকে এদেরকে অধিকার আদায়ের পথ শিখিয়েছেন। পুলিশদের দিকে তাকিয়ে শেষে এও বলেছেন ,

> এই বেচারারা তোমাদের আমাদের মতই হতভাগ্য, দুঃখী। পেটের দায়ে পাপ করে দেশদ্রোহী হয়। ওদের ক্ষমা কর, দু'দিন পরে ওরাও আসবে তোমাদের কমরেড হয়ে। যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনদিনই শিখাইনি; তোমরা তোমাদের উদ্ধার কর। সেই হবে আমারও বড় উদ্ধার।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে আনসার গ্রেফতার হয়ে রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলে বন্দী হন। রাশিয়ায় বলশেভিক চর ও বিপ্লবী নেতা হিসাবে। তার অপরাধ সে সাম্যবাদিতার জয়গান গেয়ে উঠেছিল। শোষণ শ্রেণীর হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল শোষিতদের। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

উল্লেখ্য, নজরুলের তিনটি উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রই গল্প শেষে জেলের বাসিন্দা হন। তিনজনই রাজনৈতিক অপরাধী, তিনজনই গেয়ে উঠেছিলেন সাম্যবাদীতার জয়গান। এদিক থেকে নজরুলের ব্যক্তিজীবনের স্পষ্ট ছাপ এখানে পড়ে। নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজবন্দী হিসাবে জেলে অন্তরীণ হন। নজরুল কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল, হুগলী জেল এবং বহরুমপুর জেলে রাজনৈতিক অপরাধী হিসাবে বন্দীজীবন কাটান।

কোন লেখকের জীবনের সাথেই তাঁর সাহিত্য মিলিয়ে পড়া বা গবেষণা করা উচিত নয়। কিন্তু লেখক যখন বলেন, 'লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার'-তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ঐ লেখকের সাথে তাঁর সাহিত্যকে মিলিয়ে ফেলতে হয়। নজরুলের সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে যায়।

সমাজ অস্বীকৃত জৈবিক চাহিদা নিবৃত্তি। অবলিলায় নজরুল এই প্রবৃত্তিকে মানবীয় দিক থেকে উপস্থাপনা করেছেন। কোন অপরাধবোধ, কোন ভয় কোন কিছুকে তিনি তোয়াক্কা করেননি এখানে এবং পাঠকের কাছেও তা একবারও মনে হয় না এ মিলন অপরাধ। বলা যায়, শুধুমাত্র উপস্থাপনার সাবলীলতাতেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। শেষ তথা আটাশ পরিচ্ছদে বুঁচিকে উদ্দেশ্য করে আনসারের প্রেমিকা রুবীর চিঠিতে এর উল্লেখ রয়েছে এভাবে ,

> আমি জানতাম এ রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি। নইলে যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এ মৃত্যুক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন?
> সে যখন বলল, 'রুবী, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর! আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই'।
> আমি আমার উপবাসী ভিখারী বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না। ..... আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত মুখে আত্মসমর্পণ করলাম! যদি ও না-ই বাঁচে তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেবনা, দু'দিন আগে মরবে এইত! .... সে কি তৃপ্তি, সে কি আনন্দ ওর! ..... ওর আনন্দ, ওর হাসি, ওর সুখ দেখে মনে হল, ও বুঝি বেঁচে গেল! বিষই বুঝি ওর বিষের ওষুধ হ'ল।

রুবী বিধবা। বিয়ের আগেই সে ভালবেসেছিল আনসারকে। কিন্তু নারী মোহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আনসার কখনোই রুবীকে প্রেয়সীর চোখে দেখেনি। সমাজের নীচুতলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে নিজেকে সদা সমর্পণ করেছে আনসার। রুবীর কথা ভাবার সময়ও পায়নি কখনো। কিন্তু রুবী বাল্যপ্রেমিকের স্মৃতিতে আত্মমগ্ন থেকে বাসরঘরে বসেও সেই প্রেমিকের জন্যই গেঁথেছে ফুলের মালা। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই বিধবা হয় রুবী। কিন্তু স্বামীর জন্য কখনোই এতটুকু ভালবাসা বা অনুভূতিবোধ ছিল না তার। বিধবা হবার পরও মৃত স্বামীর প্রতি কোন সহানুভূতির প্রকাশও পাওয়া যায় না রুবীর মাঝে। বরং একটু বাড়াবাড়ি রকমের যে বৈধব্য জীবনযাপন সে শুরু করে তা শুধু তার বাবা-মাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। শেষে প্রেমিক আনসার মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জেল থেকে বুঁচিকে শূন্য হৃদয়ের হাহাকারের কথা জানিয়ে চিঠি লিখলে সেই চিঠি পড়ে রুবী ছুটে যায় আনসারের কাছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে প্রেমিকের ক্ষুধার্ত হৃদয়ের কাছে। সেই পরিপূর্ণতার স্বাদ গ্রহণ করে রুবী নিজেও। সমাজ, ধর্ম, সংসার সবকিছুকে এভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করে রুবী চলে গেল।এতে করে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে তার বাবা-মা মানুষের কাছে প্রচার করে দেন যে তাদের মেয়ে মরে গেছে। রুবীর বাবা ইচ্ছাকৃত অবসর নেন চাকুরী থেকে। কিন্তু এ সবের ও জন্য রুবীর মাঝে কোন ক্ষোভ, লজ্জা বা অপরাধবোধ দেখা যায় না। 'কুহেলিকা' উপন্যাসেও নজরুল সমাজ অস্বীকৃত দেহ ভোগের কথা লিখেছেন। তবে সেটা এসেছে ভিন্ন আলোক থেকে নেহায়েতই ভালবাসার আকুলতায় প্রেমিকা নিজেকে সমর্পণ করেনি প্রেমিকের কাছে।

উপন্যাসের এই রুবী চরিত্রটি সৃষ্টিতে নজরুলের বাড়াবাড়ি রকমের আবেগ লক্ষ্য করা যায়। ফলে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র সৃষ্টিতে কিংবা সামাজিক দৃষ্টিকোন প্রকাশে নজরুলে যে জীবন ঘনিষ্ট বাস্তবতার স্বাক্ষর রেখেছেন রুবী চরিত্রে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বলা যায় রুবী চরিত্রটি নজরুলের আবেগ সর্বস্বসৃষ্টি এবং সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে কোন ছায়া পাত এই চরিত্রে ঘটেনি।

কুহেলিকা

'কুহেলিকা' উপন্যাসে সমকালীন যে সমাজচিত্রটি পাওয়া যায় সেটিকেও একটি সমকালীন সমাজ দর্পণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় দ্বিধাহীন ভাবে । অত্যন্ত স্পর্শকাতর এর পটভূমি। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হারুন, আমজাদ, আশরাফ, রায়হান ওরফে কুম্ভীর মিয়া, তারিক,ইউসুফ, তমিজ, প্রমত্ত, সমরেশ, ভূণী, মোমি, জয়ন্তী দেবী, চম্পা, দেওয়ান সাহেব, হারুনের মা-বাবা, উলঝুলুল ওরফে জাহাঙ্গীর এবং জাহাঙ্গীরের মা চরিত্র সমূহের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। সমকালীন যেসব সমাজচিত্র তুলে আনা হয়েছে উপন্যাসে তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো-

মেসে'র জীবনচিত্র। কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়ে মেসে উঠে ছাত্ররা স্বল্প ব্যয়ে থাকা ও পড়াশোনা চালাতো ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসে। তারপর তাদের মাঝে গড়ে উঠতো বন্ধুত্ব। সৃষ্টি হতো আত্মার বন্ধন। উপন্যাসের শুরুতেই এ চিত্রটি অত্যন্ত বাস্তব ঘেঁষা হয়ে চিত্রিত হয়েছে এভাবে ,

> যে স্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে 'মেস' হইলেও হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা। দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ-বাইশজন তরুণ। ইহাদের একজন লক্ষ্মী ছাড়ার মতো চেহারা- একজন ইয়ারের উরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে।... উলঝুলুল পুঞ্জীভূত ধুম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদগীরণ করিয়া আরো বলিবার আয়োজন করিতে চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল, যুবকদের কাছেও নারী অপেক্ষা গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চায়ের চেয়েও

Dhaka University Institutional Repository

> প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়া গেল। তাহাদের খাইবার ধরণ দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ফেরৎ একদল বুভুক্ষু। কুন্তীর মিয়া একগালে এক ডজন লুচি ও একগালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুরিয়া মুখ সঞ্চালন বিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া কেহ হাসিতেছিল- কেহ ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মক্স করিতেছিল। আর যাহারা রাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাদেরি মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুন্তীর মিয়ার নাকে ঠাসিয়া দিল। কুন্তীর মিয়া নস্য লইতা না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভালো। .... আড্ডা যখন ভাঙ্গিল, তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে-যা পারিল দুটা মুখে গুজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।

সমকালীন এই যে সমাজচিত্র এ চিত্র সমকালকে অতিক্রম করে এখনও বর্তমান। স্বল্প ব্যায়ে মেসের জীবন, পড়াশুনা, বন্ধুত্ব, আড্ডা। এখানে ভাষার কোনো অতিরঞ্জিতকরণ নেই। ছোট্ট একটি রুমে চার-পাঁচটি চৌকির উপর আট দশ জনের এভাবেই চলে মেসের জীবন। গভীর রাত পর্যন্ত চলে আড্ডা, আড্ডার বিষয়বস্তু নারী এবং অবশেষে খাবারের মধ্যে নরীর বিসর্জন। মেসের ছেলেদের এই হচ্ছে নিত্য নৈমিত্তিক চিত্র। এরই মাঝে আবার চলে তাদের পড়াশুনা

নারী চরিত্র। নজরুলের দৃষ্টিতে নারী চরিত্রের বিভিন্নরূপের একটি বাস্তব ঘনিষ্ট চমৎকার বর্ণনা করা যায় এই উপন্যাসে। যা সমকালীনও হতে পারে। নারী কুহেলিকা, নারী প্রহেলিকা, নারী অহমিকা, নারী নায়িকা ইত্যাদি। নারী বিষয়টি যদিও সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে অতটা গুরত্ববহ হয়ে উপস্থাপিত হয়নি উপন্যাসে তথাপিও যেখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলেছে দীর্ঘসময় ধরে, হাস্যরস এবং কৌতুকের মধ্যদিয়ে তা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজচিত্র। মেসের আড্ডায় তরুণ যুবকেরা দীর্ঘসময় ধরে নারী, প্রেম এ বিষয়গুলো নিয়ে মেতে থাকতেই অধিক তৎপর। মেসের আড্ডায় নারী সম্পর্কে তরুণ কবি হারুনের মত 'নারী কুহেলিকা'। এই বক্তব্যের পক্ষে সে যে যুক্তি প্রদর্শন করে তা হলো ,

> কি গভীর রহস্য ওদের চোখে মুখে। ওরা চাঁদের মত মায়াবি; তারার মত সুদূর। ছায়াপথের মতো রহস্য।... শুধু আবছায়া, শুধু গোপন! ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দুরে। গ্রহ- লোক ওদের চোখ চেয়ে আছে অবাক হয়ে-খুকী যেমন ক'রে সন্ধ্যা তারা দেখে। ওদের হয়তো শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলের বাদলা-রাতে চারপাশের বিষাদঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে। দু'দন্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা, ওদের অনুভব কর, দেখ, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।

নারী সম্পর্কে হারুনের এ মন্তব্যে অনেকেই অনেক মন্তব্য করলো। কেউ মেনে নিল। কেউ বিরোধিতা করলো। তবে মেসের আড্ডা আরো জোরদাড় হয়ে উঠল। আইনের ছাত্র আমজাদের ভাষায় 'নারী প্রহেলিকা'। এর পক্ষে তার যুক্তি হলো 'বাবা, সাত সমুদ্দুর তের নদী সাঁতরিয়েও বিবি গুলে বকৌলির কিনারা করা যায় না।' নতুন বিবাহিত আশরাফের মতে, 'নারী অহমিকা'। এর স্বপক্ষে তার যুক্তি হলো 'তাহার বধূ ত্রয়োদশী- যৌবনোন্মুখী। কিন্তু এত সাধাসাধি করিয়া, এত চিঠি লিখিয়া,সে কেবল একটিমাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা ছিল দুইটি লাইন- 'রমণীর মন, সহস্র

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষেরি সখা সাধনার ধন!' জাহাঙ্গীর ওরফে উলঝলুল নারী সম্পর্কে সবার মতকে মৃদু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞের মতো বললো 'নারী নায়িকা'। এর পক্ষে তার মত হলো

নারী মাত্রই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলেছে।... তবে বড্ডো বজ্জ আঁটুনি- অবশ্য গেরো ফস্কা। কত 'চোখের বালি, কত ঘরে বাইরে, কত গৃহদাহ, চরিত্রহীন সৃষ্টি করছে নারী, তার ক'টাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি।... যে কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভালো করে দেখ, দেখবে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেয়া যতসব বিশেষণ কোনটাই তাকে মানায় না, তবে নারী বেচারী সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয় -তাই হবার জন্যে আমরন সাধনা করছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুশি করছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছলাকলার মহিমা। সামনে সামনে বোঝা-পড়া হলে নারীকে দেখতে শুধু নায়িকা রূপেই। তোমরা নারীকে দেখ, সে যা হলে ভালো হয়- তাই করে আর আমাদের মত নিরেট মানুষে দেখে, নারীকে সে যা আছে- তার একচুলও অতিক্রম না করে। তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্মমতায় হয়তো ব্যাথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না করলেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলংকার পরিয়ে সুন্দর করে সিঁদুর কঙ্কন পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। রাঙতার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিনহাত নারীকে বারহাত শাড়ি পরিয়ে বিপুল করে, বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হীরা জহরত সোনাদানা পরিয়ে একমণ ভারাক্রান্ত করে নারীকে প্রশংসা করার চাতুরী আমার নয়! তোমরা হয়তো চটবে, কিন্তু আমি বলি কি জানো? আমি চাই রূপার মোমতাজকে। তাজমহল দিয়ে মোমতাজকে আড়াল করার অবমাননা আমাকে পীড়া দেয়। আমার ক্ষমতা যদি থাকতো, ঐ বন্দনাগার হতে মোমতাজকে আমি মুক্তি দিতাম।

মেসের হাস্যরসের আড্ডায় নারী সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের এসব তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ বক্তব্যে সমকালীন সমাজের নারীর অবস্থানগত একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। পুরুষের চোখে নারী, সংসারের কাছে নারী, সমাজের কাছে নারীর অবস্থান এখানে দার্শনিকের মতো ব্যক্ত করেছে জাহাঙ্গীর।

জমিদারী প্রতাপ। জমিদারেরা তাদের প্রভাব কিভাবে বিস্তার করতো শুধুমাত্র প্রতিপত্তির জোরে তার সমসাময়িক একটি সমাজচিত্র উপন্যাসে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের বাবা ছিলেন কুমিল্লার বিখ্যাত জমিদার ও মানীলোক। বাবার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরই হয় তার উত্তরাধিকারী। কিন্তু জাহাঙ্গীর তার বাবার সমাজ স্বীকৃত সন্তান নয়। এ প্রশ্ন তুলে তার বাবার ভাগ্নেরা সম্পত্তির দাবি করলে জাহাঙ্গীরের মা জমিদারী কৌশলে তা রহিত করেন এভাবে ,

> জাহাঙ্গীরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিসতুত ভায়েরা সম্পত্তি দাবি করিয়া নালিশ করিল তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারী বেশিদুর গড়াইবার পূর্বেই পারিল না। অবশ্য ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিসতুত ভায়েদের অবস্থা এত বড় মামলা চালাইবার মত স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই তারা এত সহজে অভাবনীয়রূপে যে সম্পত্তি পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিল, এমনকি তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গীর সত্যসত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারী পরিচালনায় নারীও যে সিদ্ধা হস্ত ছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরের মার চরিত্রে। জাহাঙ্গীরের বাবার মৃত্যুর পর অতি তীক্ষ্ণ হাতে তিনি হাল ধরেন জমিদারীত্বের। উপরের উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণতো রয়েছেই নিচের উদ্ধৃতিটুকুতেও তা খুবই স্পষ্ট।

> বৎসর চারেক হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে-ই-এখন তাহার বিপুল জমিদারীর উত্তারিধারী। তবে তাহার মাতা আজও জীবীতা এবং জমিদারী পরিচালনা করেন তিনিই। তাহার জমিদারী পরিচালনের অতিদক্ষতা দর্শনে লোকে নাকি বলাবলি করে যে, মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারীত চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায়ও চড়িতে পারে। তাহার শাসনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল না খাক, তাহার জমিদারীর বড় বড় রুই-কাতলা ও চুনোপুটি এক জালে বদ্ধ হইয়া একসাথে নাকানি-চুবানি হইয়াছে। হিন্দু প্রজারা তাহাকে বলিত, 'রায়বাঘিনী' এবং মুসলমানরা বলিত 'খাড়ে দজ্জাল' (খরে দজ্জাল)!

সমকালীন সমাজের অতি বাস্তবচিত্র এটি। জনপ্রিয় টিভি নাটক অয়োময়েও এমন এক জমিদার গিন্নীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

জমিদারদের ব্যভিচার। সমকালীন সমাজের এটি একটি অসম্ভব বাস্তব ঘেঁষা চিত্র। জমিদাররা তাদের প্রতিপত্তির প্রভাব বিস্তার করে রংমহলে নারী নিয়ে মজা করতো। তার প্রায়শ্চিত্য করতো হাজারো পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান। তাদেরই একজন জাহাঙ্গীর। যার আর্তনাদ তৈরি করেছে উপন্যাসের পটভূমি। জমিদারদের এসব ব্যভিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'কুহেলিকা' উপন্যাস। উপন্যাসের জমিদারপুত্র জাহাঙ্গীর। সে জমিদারপুত্র ঠিকই তবে তার কামজ পুত্র। নর্তকীর সাথে দেহ মিলনের ফলে জন্ম হয় তার। ফলে বাবা-মার পাপ-পঙ্কিলতার মাঝে নিজের জন্মের জন্যে নিস্ফল আক্রোশে সমাজের বুকে হাহাকার করে মাথা কুটে মরে সে। জাহাঙ্গীরের পরিচয় পাওয়া যায়,

> তাহার মাতা কলিকাতারই একজন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার। সে তাহার পিতা-মাতার কামজ সন্তান।

জন্ম পরিচয় জানার পর ক্লান্ত, বিপর্যস্ত জাহাঙ্গীর প্রমত্তের কাছে ছুটে যায়। প্রমত্ত তখন জাহাঙ্গীরের বিপর্যস্ত চেহারা দেখে জানতে চায় 'আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করলি?' জাহাঙ্গীর তখন মাতালের মত উত্তর দিয়েছিল

> বিধাতার সঙ্গে! আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমত্ত দা! না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র- আমি জারজ পুত্র! শেষদিকে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ বেদনায়, ঘৃণায়, কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জন্ম পরিচয় নিয়ে জাহাঙ্গীরের এই আত্মগ্লানিতে প্রমত্ত সহানুভূতির ছায়াতলে তাকে জড়িয়ে ধরলে এবং 'কোন মানুষই তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়' বললে জাহাঙ্গীর একেবারে অকূলে কূল পাবার মতো দিশেহারা হয়ে পড়ে। জন্ম পরিচয়হীনতার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার আকুলতায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলে,

> সত্যি বলছেন প্রমত্ত দা? আমি তাহলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে! আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখতে পেয়েছি! দেখুন প্রমত্ত দা, আমি জীবনে কখনো কু-কথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত করেছি;-সে নারী আমার জন্মধাত্রী। না প্রমত দা আমার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

রক্তকণা অপবিত্র- আমার অনু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দুষিত প্রভৃত্তি কিলবিল করে ফিরছে বিছের বাচ্চার মতো- যে কোনো মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে আজকের মতো।... পাপের যুপকাষ্ঠে আমার বলি হয়ে গেছে।

জাহাঙ্গীরের এ আর্তনাদ প্রতিটি জারজ সন্তানের আর্তনাদ। পিতৃ পরিচয়ের জন্যে হাহাকার করে জারজ সন্তানেরা যায় বিপথে। জীবনের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে বেছে নেয় অনাকাংখিত জীবন।

স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের গভীরতা 'কুহেলিকা' উপন্যাসের রাজনৈতিক বিষয় নয়। তবু স্বদেশী আন্দোলন থেকেই যে বিপ্লববাদী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে ,

> তখন স্বদেশী যুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশংকা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতেছিল না বটে, কিন্তু বাঁধ সে ভালো করিয়াই বাঁধিতেছিল।

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের ভীত কাঁপতে শুরু করেছিল এবং এর পথ ধরেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অত:পর অপরাপর আন্দোলন সমূহের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়।

বিপ্লববাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি করেছে বিপ্লববাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বিপ্লববাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর, চম্পা, জয়ন্তী দেবী এই চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের এই রাজনৈতিক পটভূমির আবর্তন ঘটেছে। জাহাঙ্গীর যখন মাত্র স্কুলে পড়ে তখনই সে বিপ্লববাদী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে স্কুল শিক্ষক প্রমত্তের কাছে ,

> জাহাঙ্গীর তখনও বালক,-স্কুলে পড়ে। এমনি দিনে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী মন্ত্রে এই কল্পনা প্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুল মাস্টার প্রমত্ত।

উপন্যাসের তিন অনুচ্ছেদ থেকে এই রাজনৈতিক পটভূমির আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর দশ, এগার, চৌদ্দ, পনর, সতের, আঠার, উনিশ ও বিশ অনুচ্ছেদে বিভিন্নভাবে অবতারণা ঘটে এই বক্তব্যের। তিন অনুচ্ছেদে প্রমত্তের এক বক্তব্যের মাঝে টলস্টয় ভক্ত এক বিপ্লবী বলেছিল 'কিন্তু প্রমত-দা আমরা মার খেয়েই মারকে জয় করবো- এ কি একেবারেই মিথ্যা?' এর উত্তরে প্রমত্ত উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয় ,

> তা হলে আমরা বহুদিন হলো জয়ী হয়ে গেছি।! কারণ, আমরা নির্বিকারচিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিকশিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হূণ মেরেছে! আরবী ঘোড়া মেরেছে চাট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানী মেরেছে ছুরি, তুরানী হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-দিনেমার- ফরাসী ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু- যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি- তাই মেরে দিলে ইংরেজ

Dhaka University Institutional Repository

বাবাজি। এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন- 'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি' তবে তার দর্শনকে আমিশ্রদ্ধা করি- কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে।

এগারো অনুচ্ছেদে আবির্ভাব ঘটে জয়ন্তী দেবী ও চম্পার। জয়ন্তী দেবীর বোনের ছেলে পিনাকপানি। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে পড়ে পিনাকীর ফাঁসি হলে সেই দিনই গঙ্গাস্নান করে জয়ন্তীদেবী বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। জয়ন্তীদেবীর কন্যা চম্পা সেও বিপ্লবী। এরপর আর জয়ন্তী দেবীর উপস্থিতি উপন্যাসে পাওয়া যায় না
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কয়েকটি স্পষ্ট চিত্র উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন অনুচ্ছেদে। পনের অনুচ্ছেদে রয়েছে ,

জাহাঙ্গীর বলিল, সেবার কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে গেছি দাদা! আবগারী সাব-ইন্সপেক্টর যখন গাড়িতে উঠে বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে আরম্ভ করলে, তখন আমার আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া হবার জো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজনের প্যাঁটরা থেকে সের কতক আফিম বেরুতেই সে তাকে পাকড়াও করে নেমে গেল। একে একে সব বাক্স যদি খুঁজতো, কি হতো তাহলে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।'

সতের অনুচ্ছেদে রয়েছে ,

সন্ন্যাসী দল হইতে কিছু দূরে একটু নিরালায় গিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিল, তুমি আমাকে চেননা। অবশ্য, আমি তোমায় চিনি। আমাদের অত্যন্ত বিপদ। আজ ভোরে তোমার প্রমত-দা ও পিনাকীর মাসিমা অস্ত্রশস্ত্রসমেত ধরা পড়েছেন। তোমার গাড়িতে তুলে দেবেন বলে তারা গরুর গাড়িতে করে সেসব আনছিলেন, রাস্তায় পুলিশ পাকড়েছে। এ খবর পুলিশ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, অন্যান্য সকলকে ধর-পাকড়ের জন্যে।... পুলিশদের দু'জন মারা গেছে আমাদের গুলিতে-তোমার উপর বজ্রপাণির আদেশ, মাসিমার মেয়ে চম্পাকে নিয়ে কলকাতায় আপাতত তোমাদের বাসায় রাখবে। তারপর দু'একদিনের মধ্যে বজ্রপাণি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাবেন। চম্পাকে বোরকা পরিয়ে মুসলমান মেয়ে সাজিয়ে রেখেছি। সে একটু পরেই স্টেশনে আসবে- তুমি তাকে তোমাদের গাড়িতে তুলে নিও। খুব সাবধানে কিন্তু, পুলিশ ভয়ানক কড়া পাহরা দিচ্ছে প্লাটফর্মে। প্লাটফর্মে চম্পার সাথে এক বাক্স মালপত্র আছে। সাবধান! প্রাণ দিতে হয় দিও, তবু সেসব যেন বে-হাত না হয়। যাও'- বলিয়াই সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতে দিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'বোম্ কালী কালকাত্তাওয়ালী'।

আঠার অনুচ্ছেদে রয়েছে ,

জাহাঙ্গীর বলিল, 'অনেকগুলো গোড়া আর পুলিশ আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করছিল, দেখেছ?'
হারুন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।
জাহাঙ্গীর বলিল, 'ওরা খুব সম্ভব আমাকে এরেস্ট করবে। হয়তো আমাদের গাড়িও সার্চ করবে। সার্চ যদি করে- তাহলে আমরা সকলেই ভীষণ বিপদে পড়বো। তোমাকে সব কথা খুলে বলি, যাকে আমিনা বলে ভেবেছ- সে আমিনা নয়- আমাদের বিপ্লবী দলের একটি মেয়ে।
ওর কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওরা সকলেই ঘুমুচ্ছে- এই অবসরে আমি আর ঐ আমিনা নেমে পড়বো স্টেশনে। তুমি আস্তে আস্তে ওর বাক্সটা নামিয়ে দেবে।... মাকে বলো- আমিনার মামা তার করায় বর্ধমান স্টেশনে তা পেয়ে আমি আমিনাকে আবার অন্ডাল পৌছে দিতে যাচ্ছি... বলিয়াই সে আস্তে ধাক্কা দিয়া চম্পাকে জাগাইল। চম্পাকে সাঙ্কেতিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতে কি কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার বুকের নিচে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

তাহার পর বাক্স দুইটি আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় টানিয়া দরজা খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। জাহাঙ্গীর আবার তাহাকে কি বলিতে সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া হিন্দু- সধবার বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া আসিল। জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি ইউরোপীয়ান বেশে সজ্জিত হইয়া লইল। ইত্যবসরে ট্রেন শক্তিগড়ে একটু দাঁড়াইয়াও ছাড়িবার উপক্রম করিতে তাহারা ধীরে ধীরে দুইজনে দুইটা বাক্স লইয়া নামিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর চাহিদা দেখিল, সৌভাগ্যক্রমে গোরা বা পুলিশের কেহ সেদিকে লক্ষ্য করিল না।'

বিপ্লববাদীদের মাঝে মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব। জাহাঙ্গীরকে বিপ্লববাদে দীক্ষা দেয়া নিয়ে এই মনোভাবের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে অনিমেষ, সমরেশ প্রমুখ বিপ্লববাদীদের মাঝে। জাহাঙ্গীরকে বিপ্লববাদে দীক্ষা দেওয়ায় তাদের একটাই আপত্তি জাহাঙ্গীর মুসলমান। দীক্ষাপ্রাপ্ত কোনো বিপ্লবীদেরই অধিকার ছিলনা নেতার সিদ্ধান্তের মুখে কোন কথা বলা। তারপরও এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ওদের প্রতিবাদের মুখে জাহাঙ্গীরকে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা দেয়ার স্বপক্ষে প্রমত্ত বলেন ;

দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার এ- মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে, বাঙলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য, তার স্পষ্ট নিষেধ থাকলে আমি জাহাঙ্গীরকে এ দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকরীলোভী, না হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ঐ রকমের তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখিনে। তাছাড়া আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরীলোভী, কম ভীরু- এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়। দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি- ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আর, ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাঙলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে শক্তি যে তেজ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাকবে না কেন? তাছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা, 'অহিংসা পরম ধর্ম'কে কখনো বড় করে দেখেনি! দুর্বলরা অহিংসার যতবড় সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটে মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই।

মুসলমান সম্পর্কে প্রমত্তের এই দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুদের প্রচণ্ড একটা হীনমন্যতার স্পষ্টতা ফুটে ওঠে। প্রমত্তের এই বক্তব্যের পেছনে এ কণ্ঠস্বর লেখকের বলেও মনে হয়। কারণ লেখক অসাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রমত্তের এই দীর্ঘ বক্তব্যের পরও জাহাঙ্গীরের প্রিয় বন্ধু অনিমেষ বললো ,

প্রমত-দা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখেনি! তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসেবে। সে হিসেবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর না বাঁধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি- ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।

এখানে নিজ ধর্ম সম্পর্কে অনিমেষের একটি সরল স্বীকারোক্তি ধরা পড়ে। বন্ধুত্ব যতই গাঢ় হোক দলীয় কোন মত বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারা তা ছাড় দিতে রাজী নয়। সমরেশ ধর্ম সম্পর্কে আরো সচেতন। সে একেবারে কোন ভূমিকা না রেখেই সরাসরি বলে

Dhaka University Institutional Repository

ফেললো 'আচ্ছা প্রমত-দা, মুসলমানকে বাদ দিয়েও তো আমরা স্বাধীন হতে পারি।' সমরেশের এই নির্লজ্জ উক্তিতে প্রমত্ত বললো,

> নিশ্চয়, অনেক দেশই তাদের স্বদেশবাসীর অন্তত বারোআনা লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমরা তা পারবো না। কেউ যদি পারে ইংরেজ ও মুসলমানকে একসাথে তাড়াতে, তাড়াক। অন্তত আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে অন্য যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচারণ সহ্য করেছিল- তাদের তাড়াবার পাগলামি ত তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। যে বিপ্লববাধিপ বলেন- 'আগে মুসলমানকে তাড়াতে হবে, তিনি ভুলে যান যে যদি তার এ অতিক্ষমতাবাদ থাকতোও, তাহলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যেদিন ভারত একজাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হবে। এ কথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে। হিন্দু মুসলমান এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত সম্রাজ্য রক্ষার রক্ষাকবচ।

প্রমত্তের এই বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুসলমানদের প্রতি অসাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রশংসা করে সমরেশ পুনরায় তার মত ব্যক্ত করে এভাবে ,

> প্রমত-দা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই জাহাঙ্গীর তো নয়ই, জাহাঙ্গীরের ভুতও নয়। তারা মনে করে, আমাদের স্বদেশী আন্দোলন মানে হিন্দু রাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মত আরব-কাবুল-ইরান-তুরানের দিকে চেয়ে আছে- কখন ঐ দেশের মিয়া সায়েবরা এসে ভারত জয় করে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। ওরা ভুলে যায় নাদির শা, তৈমুরের কথা!

মুসলমান সম্পর্কে সমরেশের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রমত্ত যা বলে তাকে আর তার অসাম্প্রদায়িক ভাবনা বলে মেনে নেয়া যায় না। মুসলমানদের ভীরুতা, হিন্দুদের স্বেচ্ছাচারিতার একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমত্তের বক্তব্য হচ্ছে,

> মুসলমানরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ! মাতৃসমিতির অধিনায়কের মত নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দুর করতে হবে। নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই। মাতৃ-সমিতির মত আমাদের সঙ্গে যদি ঐ মত হোত যে মুসলমানকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তাহলে দেশকে যতই ভালোবাসি না কেন, এর সঙ্গে আমি যোগদান করতাম না। মুসলমানদের যদি কোনো দোষত্রুটি থাকেই, তবে তার সংশোধনের সাধনা করবো। তাদের তাড়াবার মত পাগলামি যেন আমায় কোনোদিন পেয়ে না বসে। আর, ইরান-তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুববেশি দোষ দেওয়াও চলে না। দুর্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্যদেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে- যদিও ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের জন্যে ইরান-তুরান-আরব-কাবুল কারুরই কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমাদের সাধনা হবে- ওদের ঐ পরদেশমুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা। যে মাটি ওদের ফুলে-ফলে-শষ্যে-জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন-পালন করছে, সেই সর্বসহা ধরিত্রীর, মুক মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাদের রক্তে এই মন্ত্র জ্বালা করে ফিরবে যে, জননীর স্তন্যপানের যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তারও চেয়ে বড় ঋণ আমাদের দেশজননীর কাছে- যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ-মন-দেহ অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে- যে দেশ আমার পিতার জননী, আমার জননীর জননী!

Dhaka University Institutional Repository

প্রমত্তের দেশ প্রেমিকতায় কোন কার্পণ্য নেই। কোন দ্বিমত অমনোযোগ বা একনিষ্ঠতার কোন ছাপ নেই। দেশ-মাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ সে। কিন্তু নিজের ধর্মের ব্যাপারে বড্ড বেশী অহংকারী। মুসলমানদের প্রতি কোথাও কোথাও তার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলেও কোথাও তার নিজ ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা এবং গর্ববোধ মুসলমানদের প্রতি তাঁর হীনমন্যতারই স্পষ্ট প্রকাশ। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের সমকালীন রাজনৈতিক মনোভাব প্রমত্ত চরিত্রে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের সুখী সুন্দর জীবনচিত্র। পরিবারটি জাহাঙ্গীরের বন্ধু হারুনদের। হারুনের মা উম্মাদিনী। হারুনের বড় একটি ভাই ছিল। হারুনের চেয়ে বছর দুই বড়। নাম মীনা। তের বছর বয়সে সে মারা যায়। তখন থেকেই পুত্রশোকে হারুনের মা উম্মাদ হয়ে যান। মিনা মৃত্যুর সময় বিকারগ্রস্ত অবস্থায় 'আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও'- বলে অনেক কেঁদেছিল। হারুনের মা এখন উম্মাদগ্রস্ত অবস্থায় 'মীনা', আর 'সাইকেল' বলেই পাগলামি করেন বেশী।

হারুনের বাবা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ। ছোট দুই বোন ভূণী আর মোমী, ছোট ভাই মোবারক। হারুন কলকাতার মেসে থেকে টিউশনি করে কলেজে পড়ে। বাবার পেনশনের স্বল্প টাকায় অতি দীনভাবে সংসার চলে ওদের। তারপরও আতিথেয়তা বা নিজেদের মাঝে সুখের কমতি নেই এদের। হারুনদের বাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে ,

> গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই-একটি বাড়ির পরেই তাহাদের জীর্ণ খেড়ো ঘর। হারুন ঘরের দুয়ারে আসিয়া পহুঁছিতেই তাহার দুইটি বোন ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুনের পিছনে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল।
> হারুন বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙ্গা তক্তপোষে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, দোহাই হারুন, তোমার ভদ্রতা রাখ।

সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ। সন্তানের জন্য মায়ের যে শাশ্বত আকুতি হারুনের উম্মাদিনী মায়ের মাঝে সেই আকুতি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন লেখক। যৌবনোন্মুখ পুত্রকে হারিয়ে হারুনের মা উম্মাদিনী হয়েছেন। পুত্রের নাম ছিল মিনা। এবং মিনা মৃত্যুর সময় বিকারের ঘোরে একটি সাইকেলের আবদার করেছিল। হারুনের মা উম্মাদিনী হয়ে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও পুত্রের নাম এবং তার আবদার ভুলতে পারেননি। সেও উম্মাদগ্রস্ত অবস্থায় ঐ দুটি কথাই শুধু এভাবে সেভাবে বলে। জাহাঙ্গীরকে দেখেও পুত্রশোকে হারুনের মা কেঁদে বলেন- *'মিনা এসেছিস? অ্যাঁ? তোর সাইকেল কই? আমার পালকি কই?*

নারীর আত্মমর্যাদাবোধ এবং তার নারীত্ব সম্পর্কে সংস্কার বোধ। ভূণী এবং চম্পা চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে নারীর চিরাচরিত একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ভূণীরা একসময় প্রতাপশালী ছিল কিন্তু কালের কড়ালগ্রাসে এখন নিঃস্ব। কিন্তু আত্মমর্যদাবোধ এখনো এতটুকু নড়বড়ে হয়নি। জাহাঙ্গীর তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে তার উম্মাদিনী মায়ের দ্বারা জাহাঙ্গীরের সাথে এক অনাকাঙ্খিত ঘটনার মুখোমুখি হয় সে। এবং এই অনাকাঙ্খিত ঘটনাকে জাহাঙ্গীর অনাকাঙ্খিত ভাবলেও ভূণী তাকে খোদার ইঙ্গিত বলেই মেনে নেয়। জাহাঙ্গীর তার আর্তিতেও চলে যায়। এবং স্টেশনে পৌঁছে কি মনে করে ভূণীকে চিঠি লিখে পাঠায়। জাহাঙ্গীরের পত্রের উত্তরে ভূণী যে পত্র লিখে তা থেকেই ভূণীর আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভূনী লিখেছিল

Dhaka University Institutional Repository

যদি মা আমাকে আপনার হাতে সপিয়া না দিতেন, আমি আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া অপমানজনক মনে করিতাম। আপনি যাহাকে চিরজীবনের নির্বাসন-দন্ড দিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ তাহার প্রতি এই করুণার হেতু কি, জানি না। আমি আপনাকে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা হৃদয় ছাড়া আপনার সকল কিছুই আছে। কিন্তু সে সকল লইয়াত-নারী আমি-আমার কোনো লাভ নাই। দুঃখের সমুদ্রে কলার ভেলায় আমরা ভাসিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিপুল অর্ণব-পোত আমাদের কাছে আসিল। উদ্ধার পাইবার আশা করি নাই, বরং মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল- তাহাই ফলিয়া গেল। আপনার জাহাজের ঢেউ লাগিয়া আমাদের কলার ভেলাখানি ডুবিয়া গেল। এখন তরঙ্গের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্যপথ নাই। যতদিন শক্তি থাকিবে যুদ্ধ করিব।

আপনি কূলে উঠিয়াছেন। যাহারা তরঙ্গে ডুবিতেছে- তাহাদের লইয়া এ বিদ্রুপ কেন?

ইচ্ছা করলেই কি আপনার কূলে উঠিতে পারি? আপনি কি ভাবিয়া আমায় ডাকিয়াছেন, জানি না। যে অধিকার আমার মা আপনাকে দিয়াছেন-সেই অধিকারের দাবী লইয়া যেদিন শুধু আপনি নন- আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন- সেই দিন হয়ত যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্বে নয়। লোক-সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া আপনার কাছে গেলে আপনিই আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না। অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরের দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারিব।

আশা করি, আপনি আমায় ভুল বুঝিবেন না এবং আর এরূপ ছেলেমানুষিও করিবেন না। আমার আত্মসম্মান আপনার আত্মসম্মানের চেয়ে কোনো অংশে হীন বা কম নহে।

বাহিরের ঐশ্বর্যের দম্ভ আমার নাই, আমরা দরিদ্র; কিন্তু অন্তরের ঐশ্বয্য গৌরব আমার অন্তরে আপনার অপেক্ষা কম নাই।

আমাদের মাঝে যে অকূল পারাবার বহিয়া চলিল- তাহাই হয়ত আমার নিয়তি।

এ কূলে আপনি আসিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। ওকূল হইতে আজ হাতছানি দিয়া ডাকিবেন না। মানুষেরইত মন, একবার যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি প্রলোভনের বশে একূল-ওকূল দুই কূলই হারাইব।

মা আপনার জন্য এখনো কাঁদেন। বলেন, মীনা এসে চলে গেল! ও আর আসবে না! যদি উপযুক্ত চিকিৎসা হইত, মা হয়ত ভাল হইলেও হইতে পারিতেন।

এইবার বাবার আর দাদার পাগল হইতে বাকী, আপনার অনুগ্রহে হয়ত তাহারও আর বিলম্ব নাই।

আপনি কি যাদু জানেন? মোমি আর মোবারক আজও আপনার ওকালতি করে! দুটো কাপড় আর দু-হাড়ি সন্দেশের এমনই মোহ! চির-দুঃখী কিনা!

আমাকে ভুলিয়াও যে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আরও ধন্যবাদ দিব, যদি স্মরণ করিয়া ভুলিয়া যান এবং এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি প্রেরণ না করেন।

ইতি
আপনার দয়াঋণী
তহমিনা।

ভূণীর এই দীর্ঘ চিঠি থেকে একজন নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। কষ্টে কষ্টে সে জর্জরিত। তারপরও নারী ব্যক্তিত্ব-আত্মসম্মান সে এতটুকু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু এই ভূণীকেই আবার দেখা যায় মুহূর্তের দুর্বলতায় জাহাঙ্গীরের সাথে তার একটি অবৈধ সম্পর্ক ঘটে যায়। তখন সে একেবারে নুয়ে পরে। আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব,

Dhaka University Institutional Repository

আত্মমর্যাদাবোধ সবকিছুকে উপড়ে ফেলে সে নির্বিকারভাবে যেতে রাজী হয় জাহাঙ্গীরের মার সাথে। সবকিছুর উর্ধ্বে সে তার নারীত্ব মর্যাদাকে তুলে ধরে। চম্পা চরিত্রটিও নারীত্ব মর্যাদায় মহিমান্বিত। জাহাঙ্গীর ট্রেনের কামরায় চম্পাকেও দুর্বলতার ঘোরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আহবান জানালে চম্পা যে কথা বলে তাতেও তার নারীত্বকেই নারী জীবনের সবচেয়ে উর্দ্ধে বলে তুলে ধরা হয়।

> চম্পা রহস্যভরা হাসি হাসিয়া বলিল, তোমায় বাঁধা দেব না। জানি আগুনের তৃষ্ণা কত প্রবল। কিন্তু কি হবে এ করে? .....আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ না করি কাল করতে হবে। কারণ, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমারও আর কোন অবলম্বন নাই। ..... লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমারও কম নেই। কিন্তু এর যে একটামাত্র পথ খোলা ছিল সে পথও তো তুমিই বন্ধ করেছ। ..... তোমার মায়ের টাকা আছে, তুমি হয়ত বেঁচে গেলেও যেতে পার- কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কি তোমার দেবদাসী হয়ে থাকব? জাত-ধর্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই আমি পাইনি। কিন্তু আমার নারী ধর্মত আছে। তাকে আজ যদি বিসর্জন দেই, কাল তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে- যেমন করে ভুণীকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছো। ..... মরনোন্মুখ তৃষ্ণাতুর তুমি এসে দাঁড়িয়েছ- তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই- তবু ঐটুকুর বিনিময়ে আমার এমন অমুল্য শ্রদ্ধাটুকু কেড়ে নিও না। চম্পা সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

এখানে চম্পার আর্তিতেও তার নারীত্বই সবকিছুর উর্দ্ধে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর যৌবনতৃষ্ণা আছে কিন্তু সে অসামাজিকভাবে কিংবা সমাজ অস্বীকৃতভাবে সে তার সে যৌবনতৃষ্ণা মেটাতে বা বিসর্জন দিতে রাজী নয়। অথচ মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে আমরা দেখি রুবীকে মরনোন্মুখ আনসারের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে। এবং সেখানে তার কোন অনুশোচনাবোধ বা অপরাধবোধের অনুভূতি নেই। বরং প্রিয়তমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারার আনন্দই প্রকাশমান। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে আরেক নারীকে পাওয়া যায় অসামাজিক সম্পর্কের মাঝে। সে ফেরদৌসী বেগম ওরফে জাহাঙ্গীরের মা। পুত্রের সাথে মনের দিক থেকে তার যে দূরত্ব লক্ষ্য করা যায় সেখানেও তাকে তার অসামাজিক যৌবনতৃষ্ণা মেটানোর প্রতি অনুশোচনাই ফুটে উঠে। সে বাইজী। হয়তবা জাহাঙ্গীর, ভুণীর মতই তাদেরও মুহূর্তের দুর্বলতায় ঘটেছিল দেহের মিলন। যদিও উপন্যাসে এই বক্তব্য অনুপস্থিত। কিন্তু পুত্রের প্রতি তার স্নেহ, দূর মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার বাসনা সবকিছু থেকে এটাই ধরে নেয়া যায়।

কামজ সন্তানের আত্মমর্যাদাবোধ। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের এই বক্তব্য সমাজের এক বিশেষ দর্পণ। 'বিয়ে' হচ্ছে যৌবনতৃষ্ণা মেটানোর সামাজিক স্বীকৃতি। এই যৌবনতৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে নর-নারীর মাধ্যমে যে নতুন সন্তান উৎপাদিত হয় তারাও সমাজ স্বীকৃত। সমাজ তখন এই নতুন অতিথিকে বরণ করে নেয় বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে। সমাজস্বীকৃত এ সম্পর্কের বাইরে নর-নারী যৌবনতৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে যে সন্তান উৎপাদন করে সমাজ তখন তাকে বরণত করেই না বরং হেয় চোখে দেখে। আর দশটা শিশুর মতই তার জন্ম হলেও সে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় শুধু তার জন্ম পরিচয়ের জন্য। জন্ম-পরিচয়ের সেই যন্ত্রণাবোধ যে কত তীব্র তা 'কুহেলিকা' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে জাহাঙ্গীর চরিত্রটির মধ্যদিয়ে। জাহাঙ্গীরের জন্ম পরিচয়ের আত্ম-যন্ত্রণার কয়েকটি চিত্র ,

> ১। জাহাঙ্গীর ঝটিকা উৎপাটিত মহীরুহের মত মায়ের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া বলিল, বল মা, এ কি সত্যি? এ-সব-কি শুনি?

Dhaka University Institutional Repository

২। ফেরদৌস বেগম পুত্রের এই অগ্নুৎগার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত ধুমায়মান চোখ-মুখ দেখিয়া রীতিমত ভয় খাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি কোনরূপে শুধু বলিতে পারিলেন, কি হয়েছে খোকা? ওকি, অমন করছিস কেন?

৩। জাহাঙ্গীর বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, বাবার ভাগ্নেরা সম্পত্তির দাবি করে নালিশ করেছে- আমি- আমি- আমি নাকি জারজ-পুত্র, তুমি নাকি বাইজী- তার বিবাহিত স্ত্রী নও- তার রক্ষিতা- আমি খান বাহাদুরের রক্ষিতার পুত্র?— কান্নায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মুখে তাহার ফেনা উঠিতেছিল। লেলিহান অগ্নিশিখার মত সে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বিদীর্ণ কণ্ঠে সে তাহার জননীর পায়ে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, বল মা, এ মিথ্যা-মিথ্যা! ওরা সব মিথ্যা কথা বলছে- আমি যে সূর্যালোকে আর মুখ তুলতে পারছিনে। মা! মা! .....।

৪। জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া তাহার মাতার হাত ধরিয়া প্রচন্ডবেগে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, - বল- নইলে খুন করব তোমাকে! বল তুমি খান বাহাদুরের রক্ষিতা না আমার মা! - বলিয়াই সে যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল। ও যেন উহার স্বর নয়, ও-স্বর উহার পিতার, ও রসনা যেন ফখরোল সাহেবের। তাহার মাঝে তাহার পিতাকে এই সে প্রথম অনুভব করিল!
জাহাঙ্গীর আর একটিও কথা না বলিয়া মন্ত্র-ত্রস্ত সর্পের মত মাথা নোয়াইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল।.....

৫। জাহাঙ্গীর যখন উন্মত্ত মাতালের মত প্রমত্তের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃত দিবসের পান্ডুর মুখ সন্ধ্যার কালো কাফন দিয়া ঢাকা হইতেছে। ..... প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে নিজেদের বিপদের কল্পনা করিয়া বলিয়া উঠিল, ... আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করলি?
জাহাঙ্গীর বলিল, বিধাতার সঙ্গে! আমি এ পবিত্র-ব্রত নিতে পারি না প্রমত-দা। না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র- আমি জারজ পুত্র। শেষ দিকে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায় কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।
প্রমত্ত গভীর স্নেহে জাহাঙ্গীরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। ..... যাক ওতে তোর লজ্জার কি আছে বলত! যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্যই করতে হয়, তা করবে বা করছে তারা যারা এর জন্যে দায়ী। কোন অসহায় মানুষইত তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়। জাহাঙ্গীর যেন পথহারা অন্ধকারে কাহার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পাইল.....
সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, সত্যি বলছেন প্রমত-দা? আমি তাহলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে, আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু পিতাকে দেখতে পেয়েছি।

নিজের প্রতি জাহাঙ্গীরের এই আর্তি, অভিমান, অপমান বোধ এর পরে যখনই উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটেছে জাহাঙ্গীরের তখনই তা প্রকাশ পেয়েছে গভীরভাবে। গভীর বেদনাবোধ নিয়ে। কখনো মনে হয় যেন জারজ সন্তানের এই আর্তি প্রকাশের জন্যই নজরুল এই উপন্যাসের অবতাড়না ঘটিয়েছেন। এই বক্তব্যকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্যই আর সব ঘটনার উপস্থিতি ঘটেছে উপন্যাসে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশী বিপ্লববাদীদের উপর বৃটিশদের নির্যাতন। বজ্রপাণি, প্রমত্ত জাহাঙ্গীর প্রমুখ বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরের শাস্তিদানের মধ্যে দিয়েই এটি প্রকাশিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী, স্বদেশী বিপ্লববাদীদের উপর বৃটিশদের নির্যাতন, অত্যাচার সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিপ্লবযুগ ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতনের যুগ। বিপ্লবীরা জানতেন ধরা পড়লে তাদের মৃত্যু কিংবা দ্বীপান্তরই একমাত্র শাস্তি। সুতরাং এ শাস্তির কথা জেনেই বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে। বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর প্রমুখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন এ চিত্রটি প্রকাশমান।

সমকালীন বৃটিশ নির্যাতনের সাদৃশ্য রয়েছে পিনাকী চরিত্রটির সাথে ক্ষুদিরাম বসুর। বিপ্লবী অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুরও ফাঁসি হয়েছিল মাত্র আঠার বছর বয়সে। পিনাকীর মতো সেও হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল ফাঁসির মঞ্চে। সমকালীন সমাজচিত্রের এটি একটি ঐতিহাসিক দর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নজরুলের ছোটগল্পে সমকালীন সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

সর্বমোট উনিশটি ছোটগল্প নিয়ে নজরুলের ছোটগল্প সম্ভার। তার মাঝে আঠারটি ছোটগল্প 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' এবং 'শিউলি মালা' গল্পগ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত। একমাত্র 'বনের পাপিয়া' গল্পটি কোথাও গ্রন্থিত হয়নি। এই গল্পটির সন্ধান পাওয়া যায় নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত 'নজরুলের ছোটগল্প (১৯৯৫)' গ্রন্থে। গল্পটি তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন তাও জানা যায়নি।

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত শুধুছোটগল্পই শুধু নয়। এটি নজরুলের সাহিত্যিক জীবনেরও প্রথম প্রকাশিত গল্প। 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংযোজন 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজী ১৯১৯ এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'সওগাত' সংখ্যায়। এটি প্রকাশিত হবার পর 'আবুল মনসুর আহমদ' তাঁর 'জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ঃ নজরুল ইসলাম' শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেছেন ১

> ১৯১৯ সালের এক ছুটিতে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে একদিন শামসুদ্দিন (সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আবুল কালাম শামসুদ্দিন) ও আমি মাসিক কাগজপত্র পড়ছিলাম। হঠাৎ 'মোসলেম ভারত'এ কি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ঠিক মনে নেই 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে একটি রস-রচনা পড়লাম। একসঙ্গে দু'জনে উঠে বসলাম বিস্ময়ে। প্রশ্ন করলাম কার লেখা এটা? তখন লেখার শেষে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিল। লেখার শেষে দেখলাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, করাচী বন্দর। কোন মুসলমান ভাল বাংলা লিখতে পারে-একথা তখন অবিশ্বাস্য ছিল। 'বিষাদ- সিন্ধু' মীর মোশাররফ হোসেন লিখেছেন, এটা সেকালের অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কজেই আমরা একাধিক বার সেই লেখা পড়লাম। ..... অবশেষে দুই বন্ধুতে একমত হলাম, যদি সত্যিই এই লেখক মুসলমান হয়ে থাকে, তবে সে একদিন বাংলা সাহিত্যের একটা দিকপাল হবে।

উল্লেখ্য,'আবুল মনসুর আহমদ' যে পত্রিকাটিতে গল্পটি পড়েছিলেন সেটি ছিল 'সওগাত'।এবং তাঁর কথা পরবর্তিতে সত্যি হয়েছিল। আবুল মনসুরের এই উক্তি থেকে আরও একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, মুসলমান কোন লেখক নজরুলের সময় ছিল না। এমনকি হিন্দু লেখকগণও এমন একটি আত্মম্ভরিতায় ভুগতেন যে, মুসলমানেরা যে ভাল লিখতে জানে তাই তারা বিশ্বাস করতে পারতো না।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'নজরুলের ছোটগল্পে সমকালীন সমাজ'। সমকাল বলতে এখানে বুঝানো হচ্ছে নজরুল যে সময়ের লেখক ছিলেন। অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম তিন দশক। এ সময়ের মাঝেই বাংলা ছোটগল্প জগতে নজরুলের বিচরণ ছিল। এ সময়ের মাঝেই তিনি রচনা করেছেন উনিশটি ছোটগল্প। এই উনিশটি ছোটগল্পের মাঝে তার সমকালের দেশ কাল সমাজ কতটা প্রতিভাত হয়েছে তাই আমার আলোচ্য বিষয়। নজরুল সমকালের লেখক, যুগের লেখক এটা সর্বজন স্বীকারোক্তি। সমকালকে উপেক্ষা করে নজরুল তার লেখনি চালনা করতে পারেন নি। তার প্রথম গল্প 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' ই তার প্রথম প্রমাণ। পরবর্তীতে গল্প আলোচনায় তা বিষদ আলোচিত হয়েছে। নজরুল সরাসরি রাজনীতিবিদ ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগাদানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৭সালে সেনাবাহিনীতে যোগদেন। তখন তিনি করাচী সেনানিবাসে অবস্থান করেছিলেন।সেখান থেকেই ১৯১৯ সালে রচনা করেন বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী । গল্পের শুরুতেই তিনি সমকালীন রাজনীতিকে তুলে এনেছেন এভাবে *"বাঙালী পল্টনের একটি বাওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে ঃ নীচে তাহাই লেখা হইল । সে বাগদাদে গিয়া মারা পড়ে"*।

'ব্যথার দানে' দেখা যায় নায়ক এবং প্রতিনায়ক লালফৌজে যোগদান করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সময় প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্য ভারত থেকে ট্রান্স ককেশিয়ায় প্রেরিত সৈনিকদের খবর বিপ্লবের খবরের মতোই সেনাবাহিনীর বিধিনিষেধ অতিক্রম করে নজরুলের কাছে পৌছে গিয়েছিল। বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী ছেড়ে ভারতীয় সেনাদের লালফৌজে যোগদানের ঘটনাই এখানে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ এবং রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে হেনা, ঘুমের ঘোরে, রিক্তের বেদন ও মেহের নেগার গল্পে। প্রতিটি গল্পেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিই নজরুলের পক্ষপাতিত্ত দেখা যায়। বলা যায় নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষ সৈনিক ছিলেন বলেই এমনটি ঘটেছে হয়ত। রাজবন্দীর চিঠিতে 'শ্রীধুমকেতু' নামক এক ব্যর্থ প্রেমিক প্রেসিডেন্সী জেল থেকে এক দীর্ঘ পত্র লিখছে তার মানসীকে উদ্দেশ করে। কিন্তু কি কারণে সে জেলে বন্দী তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না গল্পে। ব্যর্থ অভিমানের এক সিন্ধু অভিযোগে ভরা পত্রটি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় নজরুল ১৯২২সালের ১৯শে নভেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দী হিসেবে আটক ছিলেন।এ সময় তিনি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে একটি প্রবন্ধও রচনা করেন। ধারণা করা যেতে পারে সেই স্মৃতি থেকেই নজরুল পটভূমি তৈরী করেছেন 'রাজবন্দীর চিঠি ' গল্পটির।

নজরুলের ছোটগল্পে সমকালীন অর্থনৈতিক দিকটির সরাসরি কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও সামাজিক আবহে তিনি যা লিখেছেন সেখান থেকেই অর্থনৈতিক চিত্রটি ফুটে ওঠে। স্বামীহারা, সালেক, বাদল বরিষণে, রাক্ষুসী, পদ্ম-গোখরো,অগ্নি-গিরি প্রমুখ গল্পে নজরুল সমকালীন যে সমাজকে তুলে এনেছেন তা যুগোত্তরের ও বক্তব্য ধারণ করে আছে।

অসম্ভব জীবন ঘনিষ্ট বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন নজরুল। তাঁর কৈশোর কেটেছে রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে, যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সেনানিবাসে আর যৌবন কলকাতা নগরীতে। অসম্ভব ডানপিটেও ছিলেন তিনি। মিশেছেন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের দুঃখ কষ্টকে ভেবেছেন নিজের সাথে এক করে। ফলে নজরুলের গল্পের যে সমকালীন বাস্তবতা তা ঐতিহাসিক।

'বাদল-বরিষণে'র কাজরীর যে মনোকষ্ট কিংবা 'স্বামীহারা'র বেগমের যে সামাজিক পরিনতি এবং 'রাক্ষুসী'র বিন্দির প্রতি সমাজের যে পেষণ তা সমাজের সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে না মিশলে এভাবে তুলে আনা সম্ভব নয়। সামাজিক পটভূমিকায় নজরুল কে মনোবিজ্ঞানী বলে চিহ্নিত করে ও অত্যুক্তি হয় না। এসব গল্প সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। তিনটি গল্পগ্রন্থে নজরুলের গল্পগুলো যেভাবে গ্রন্থিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো।

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশ কাল	গল্প
১। ব্যাথার দান	১ মার্চ ১৯২২ ফাল্গুন ১৩২৮	১। ব্যাথার-দান। ২। হেনা। ৩। বাদল-বরিষণে। ৪। ঘুমের ঘোরে। ৫। অতৃপ্ত কামনা। ৬। রাজবন্দীর চিঠি।
২। রিক্তের বেদন	১২জানুয়ারী ১৯২৫ পৌষ ১৩৩১	১। রিক্তের বেদন ২। বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী ৩। মেহের নেগার ৪। সাঁঝের তারা ৫। রাক্ষুসী ৬। সালেক ৭। স্বামীহারা ৮। দুরন্ত পথিক
৩। শিউলি মালা	১৬ই অক্টোবর১৯৩১ কার্তিক১৩৩৮	১। পদ্মগোখরো ২। জিনের বাদশা ৩। অগ্নি-গিরি ৪। শিউলিমালা

৪। 'বনের পাপিয়া' অগ্রন্থিত ছোটগল্প।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের অধিকাংশ ছোটগল্প আত্মকথা মূলক। নায়ক নায়িকা নিজেরা নিজেদের কথা ব্যক্ত করেছে। গল্পগুলোকে ডায়রীধর্মীও বলা যেতে পারে। এতেকরে নজরুলের মানস প্রবনতার একটি সহজ অথচ সুগভীর রূপ আমরা খুঁজে পাই। নজরুল উপনিবেশ শৃঙ্গলিত লেখক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর সাথে নজরুল কোথাও প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন কোথাও প্রত্যক্ষ ছিলেন। বৃটিশদের রক্তচক্ষুর সামনে নিরীহ বাঙ্গালীদের নতজানু অবস্থা তার উপর তখনকার প্রায় সকল কবি সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনাথের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ নজরুল মানসকে একবারে উদভ্রান্ত করে তুলেছিল।

'দুরন্ত পথিক' গল্পটিতে সমকালের সামগ্রিক একটি অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় । এই অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য যে দুরন্ত পথিক ছুটে চলে সকল বাঁধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এ নজরুলেরই মানস। নজরুলের এ মানস সমকালকে গল্পে তুলে ধরেছে এভাবে ,

> সে চলিতেছিল দুর্গম কাটা ভরা পথ দিয়ে । চলিতে চলিতে সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখি অনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে । সে-দৃষ্টিতে আশা উন্মাদনার ভাস্কর জ্যোতিঃ ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতা ভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণ ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল, 'হা' ভাই! তোমাদের এমন শক্তি ভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়? অযুত আঁখির অযুত দীপ্ত চাহনি বলিয়া উঠিল- 'ও গো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই চলার পথ চেয়ে। উহার মধ্যে কাহার স্নেহকরুণ চাউনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল, -হায়! এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য! অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত ঝংকার গর্জন করিয়া উঠিল, চোপ রাও ভীরু, এই ত মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ!

নজরুল মূলত তার সকল রচনায় মানবের শাশ্বত একটি রূপই খুঁজে বেরিয়েছেন। তার অধিকাংশ ছোটগল্পে বেদনার, বিক্ততার, বিরহের এক অব্যক্ত অভিমান ফুটে উঠলেও মূল বক্তব্য উঠে এসেছে মানবের শাশ্বত রূপ থেকেই। একে একে নজরুলের ছোটগল্পগুলো সমকালীন দেশ -কাল- সমাজের আবহে আলোচনা করা হল প্রকাশের ক্রমানুসারে।

ব্যথার দান গল্পটি 'ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়'। আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প 'ব্যথার দান'। গল্পের নায়ক দারা নায়িকা বেদৌরা এবং প্রতি নায়ক সয়ফুল মুলক ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করেছে নিজেদের কথা। গল্প সংক্ষেপ দেখা যায় দারার মা অনাথ বেদৌরাকে লালন পালন করেছে। মৃত্যুকালে এই অনাথ মেয়েকে সে পুত্র দারার হাতেই সপে দিয়ে যায়। বেদৌরার সাথে ভালবাসার সাগরে ভাসতে থাকে দারা। এরই মাঝে কোথেকে বেদৌরার মামা এসে দারার কাছ থেকে বেদৌরাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কারণ দারা বোহেমিয়ান প্রকৃতির ছিল এবং এমন ঘর বাড়ী ছাড়া এমন বয়াটে ছোকরার সাথে বেদৌরার মিলন হতে দিতে পারেন না তিনি। এরপর থেকেই দারা পাগলের মত খুঁজে ফেরে বেদৌরাকে।

বেদৌরার আত্মকথায় জানা যায়, দারার বুক থেকে যে মামা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাকে সে জুয়াচোর বলে অভিহিত করেছে এবং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে এসেছে। তারপর সয়ফুলমুলক নামক একজনের সাথে তার পরিচয় হয় এবং সয়ফুলমূলককের প্রতারণামূলক আচারণের কাছে তার নারীত্ব হারায়। এরপরই আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকে বেদৌরা।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় দারার আত্মকথায় জানা যায়, চমনে বেদৌরার সাথে দারার দেখা হয়েছিল।কিন্তু বেদৌরার মুখে তার শরীরের অশুচির কথা শুনে সে আর আগের মত গ্রহণ করতে পারেনি তাকে। কষ্টে অভিমানে আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিল সে। কিন্তু তা না করে অবশেষে এসে যোগ দেয় মুক্তি সেবক দলে।

এরপর সয়ফুলমূলকের আত্মকথায় জানা যায়, বেদৌরাকে মিথ্যা প্রলোভনে অশুচি করার জন্য সে আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ। সেই পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একপর্যায়ে সেও যোগ দেয় মুক্তিসেবক দলে। এবং সেখানে গিয়েই দেখা পায় দারার। অসমসাহসের সাথে যুদ্ধ করে দারা। এবং যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে আহত হয়ে চোখ হারায়। বাকশক্তি ও যায় রুদ্ধ হয়ে। শেষে অসহায় দারার ভার কাঁধে নিয়ে সয়ফুল মূলক পাপ মোচনের চেষ্টা করে।

সবশেষে বেদৌরার আত্মকথায় জানা যায়, দারা বেদৌরাকে ক্ষমা করেছে। কামনা আর প্রেম এক নয় বলে সে বেদৌরাকে তার অন্তর্জ্বালা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সে নিজেও অর্ন্তদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। যদিও মিলন হয়নি তাদের।

গল্পটি কামনা আরপ্রেমের মনস্তাত্বিকমূলক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার মাঝে সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে , মুক্তিসেবক দলের কথা। জানা যায় 'ব্যথার দান' গল্পটি যখন নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন তখন মুক্তিসেবক দলের জায়গায় তিনি 'লালফৌজ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক 'মুজাফফর আহমদ' গল্পটি প্রকাশের সময় লালফৌজের জায়গায় মুক্তিসেবক কথাটি ব্যবহার করেন। কারণ 'লালফৌজ' শব্দটি তখনকার সময় ব্যবহার করা তার পত্রিকার জন্য খুবই বিপদের কারণ ছিল। 'লালফৌজ' শব্দটির ব্যাখা রফিকুল ইসলামের কাছে পাওয়া যায়। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ বলশোভিকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পাশাপাশি কিংবা পরে রাশিয়াতে বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় 'রেড আর্মি ফোর্সেস' গঠন করেছিল। এই 'রেড আর্মি ফোর্সেস'কেই 'লালফৌজ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই লাল ফৌজের কথা বা মুক্তিসেবক সৈনিকদলের বর্ণনা সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের।

অনেক গবেষকই 'ব্যাথার দান'-এ রুশ বিপ্লবের প্রতি নজরুলের আকৃষ্টতার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গল্পের কোথাও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কোন তথ্য বা বর্ণনা পাওয়া যায়নি। হতে পারে 'লালফৌজ বাহিনী' রুশ বিপ্লবের পাশাপাশি সময়ের ঘটনা বলে গবেষকগণ এরকম অনুমান নির্ভর হয়ে এ মত ব্যক্ত করেছেন।

'লালফৌজ' বা 'মুক্তিসেবক দলের' আভ্যন্তরীণ নিয়ম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে এভাবে,

> মুক্তিসেবক -সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন, তার স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হয়ে যাচ্ছিল- ''ভাই দারাবী! আমাদের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস', 'মিলিটারী ক্রস' প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেননা আমরা নিজে নিজেই তো আমাদের কাজকে পুরস্কৃত ক'রতে পারিনি। আমাদের বীরত্বের, ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ! কিন্তু যারা তোমার মত এইরকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায় আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি,''

'লালফৌজ' সম্পর্কে এসব তথ্য এবং গল্পে 'লালফৌজ'-এর ব্যবহার সমকালীন দেশ-কালের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নজরুল জীবনের প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে মুক্তি কামনায় উদাত্তকণ্ঠ ছিলেন। ছিলেন আপোষহীন। তাই তার সমকালের কোন রাজনৈতিক অঙ্গনকেই তিনি বাদ রাখেননি তার কথাসাহিত্যে।

হেনা 'ব্যাথার দান' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প । 'হেনা' প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৯২৯ এবং বাংলা ১৩২৬ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' কার্তিক সংখ্যায়। এটি পূর্বোক্ত ব্যাথার দানের মত আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প। নায়ক সোহরাব ফ্রান্সের ভার্দুন ট্রেঞ্চ, প্যারিসের পাশের ঘনবন, হিন্ডেনবার্গ লাইন, বেলুচিস্তান, পেশোয়ার, কাবুল এসব স্থান থেকে বর্ণনা করেছে আত্মকথা। আফগানী যুবক সোহরাব পরদেশীর মত ঘুরে ফেরে জীবন যাপন করে। এরই মাঝে আরেক আফগানী কন্যা হেনার প্রেমে পড়ে সে। কিন্তু কোনভাবেই হেনার ভালবাসা পায় না সোহরাব।

অবশেষে যখন সে শুনল ইংরেজদের হাতে আর্মির হাবিবুল্লাহ খান শহীদ হয়েছেন তখন সব যন্ত্রণা ভুলার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করল। এবং যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে হেনার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময়ই জানতে পারল হেনা তাকে সত্যিই ভালেবেসেছে। এতদিন আফগান যুবক হয়েও দেশের জন্য সে ছুটে যায়নি বলে তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এক ফরাসী তরুণী প্রেমে পড়ে সোহরাবের। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে সে প্রেমকে। যুদ্ধে তার বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য হাবিলদার খেতাবেও ভূষিত হয় সে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কাবুলে পুনরায় আসে সোহরাব। এখানেই আরেক যুদ্ধে চরমভাবে আহত হয় সে। পাঁচটি গুলি ঢুকে তার শরীরে। আহত অবস্থায় যখন সে ছুটে চলেছে তখন হেনাও ছুটে চলে তার পেছনে। শেষ পর্যন্ত সোহরাবের কোলে মাথা রেখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে হেনা।

গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায় ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা থেকেই গল্পের পটভূমি তৈরী হয়েছে। তবে এর পরের প্রায় সবটুকুই সমকালীন সমাজের আবর্তে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও যেসব স্থান থেকে সোহরাব যুদ্ধের বর্ণনা করেছে সেসব স্থানে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের ক্যাম্প ছিল তা ঐতিহাসিক সত্যতায় পূর্ণ। যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্রটি পাওয়া যায় , যা

> ও! কি আগুন-বৃষ্টি! আর কি তার ভয়ানক শব্দ! গুড়ুম-দ্রুম-দুম! আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না। যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে? গোলা আর বোমা ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অতঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তাহলে একদিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত! আর এমনি অনবরত যদি এই বাজের চেয়েও কড়া 'দ্রুম-দ্রুম' শব্দ হত, তা'হলে লোকের কানগুলো একেবারে অকেজো হয়ে যেত।

আরেক জায়গায় রয়েছে

> পায়ের নীচে দশ-বিশটা মড়া মাথার ওপর উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফাটছে -দুম-দুম-দুম, সামনে বিশ হাত দূরে বড় বড় গোলা ফাটছে গুড়ুম, গুড়ুম, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে 'রাইফেল, আর 'মেশিনগানের' গুলি-শোঁশোঁশোঁ।

যুদ্ধক্ষেত্রের এসব দৃশ্য ঐতিহাসিকতারও দাবী রাখে। নজরুল সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি তবে তিনি যুদ্ধ সৈনিক ছিলেন এবং যুদ্ধের ভয়াবহতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশরা যে সমরক্ষেত্রে কতটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল তারও উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে ;

> কি শৃঙ্খলা এই বৃটিশ জাতিটার কাজে-কর্মে-কায়দা-কানুনে, তাই তারা আজ এত বড়। ওপর দিকে চাইতে গিয়ে আমাদের মাথার পাগড়ী পড়ে গেলেও তাদের মাথাটা দেখতে পাবনা। মোটামুটি বলতে গেলে তাদের এই দুনিয়া-জোড়া রাজত্বিটা একটা মস্ত বড় ঘড়ি, আর সেটা খুবই ঠিক চ'লছে, কেননা তার সেকেন্ডের কাঁটা থেকে ঘন্টার কাঁটা পর্যন্ত সবতাতে বড্ডো কড়া বাধাবাধি একটা নিয়ম। সেটা আবার রোজই 'অয়েন্ড' হচ্ছে। তার কোথাও একটু জং ধরে না।

সমকালীন পাশাপাশি দুটি সমাজে নারীর অবস্থানও ফুটে উঠে একটি ফরাসী তরুণীর মধ্য দিয়ে। যে তরুণী যুদ্ধ ক্ষেত্রে সোহরাবকে আচার আর মাখনমাখা রুটি দিয়ে যায়। তরুনীর বর্ণনা রয়েছে এভাবে ;

> এই সিন্ধুপারের একটা অজানা বিদেশিনী ছোট্ট মেম আমায় খানিকটা আচার আর দুটো মাখনমাখা রুটি দিয়েছিল। সেটা আর খাওয়াই হয়নি। এদেশের মেয়েরা আমাদের এত স্নেহের আর করুণার চক্ষে দেখে! হা-হা-হা-হাঃ। ..... ঐ তের-চৌদ্দ বছরের কচি মেয়েটা (আমাদের দেশে ওরকম মেয়ে নিশ্চই সন্তানের জননী নতুবা যুবতী গিন্নী) যখন আমার গলা ধরে চুমু খেয়ে বললে,- 'দাদা, এ লড়াইতে কিন্তু সত্তরকে খুব জোর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে'।
> আজ সেই বিদেশিনী কিশোরী আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কি পরিস্কার সুন্দর ফিটফাট বাড়ীগুলো এদের!মেয়েটা আমাকে খুব ভালবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমাদের দেশ হলে বলত মেয়েটা খারাব হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি-একুশ বছরের একজন যুবকের সঙ্গে একটা কুমারী কিশোরীর মেলা-মেশা আদৌ পছন্দ করত না।

এই উদ্ধৃতিতে সমকালীন দুটি সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো ফরাসী দেশের তেরচৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে যখন দিব্যি মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতো সহজ-সাবলীলভাবে কচি মেয়ে পরিচয়ে তখন সেই একই বয়সের মেয়ে আমাদের দেশে জননী বা কারো গিন্নী ছিল। নয়তো আইবুড়ো হিসাবে চারপাশে তার বদনাম রটে যেত। অপরদিকে এই বয়সেরই কোন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে কুড়ি-একুশ বছরের কোন যুবককে ডেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, আপ্যায়ন করা, অবলীলায় গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া অসম্ভব ছিল।

বাদল-বরিষণে 'ব্যাথার দান' গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প। কালো মেয়ের যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তিই এই গল্পটির মূল বক্তব্য। যে বক্তব্য সমকালীন সমাজের কালো নারীর দগ্ধ হৃদয়ের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে যুগপূর্ব এবং যুগোত্তরের বক্তব্যকেও ধারণ করে আছে। এই গল্পটিও নায়কের আত্মকথা বর্ণনার ভেতর দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। নায়ক এক ভিনদেশী যুবক। বোহেমিয়ান। শ্রাবণের শুক্লাপঞ্চমীর দিনে সে তার স্মৃতির আগল মেলে বসে। বাদল-বরিষণের দিন এটি। তিন বছর আগে ঠিক এমনি দিনে ঘটে যাওয়া তার জীবনের এক বেদনাকাতর কাহিনী সে বর্ণনা করেছে।

পাহাড়িয়া এলাকা কালিঞ্জরের উপকণ্ঠে চলছিল পাহাড়িয়াদের কাজরী উৎসব। সেখানেই কালো মেয়ে কাজরীর প্রেমে পড়ে ভিনদেশী যুবক। কিন্তু মেয়েটি কালো বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনা যুবকের ভালবাসাকে।

Dhaka University Institutional Repository

চখা হরিণীর মত ভীত-ত্রস্ত চাউনি দিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে আচমকা আর্ত আকুল স্বরে কেঁদে উঠল! আর দাঁড়াল না, হুকরে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলে। যেতে যেতে বলে গেল- নাহিরে সুন্দর পরদেশী, ম্যয় কারী কাজরিয়া হুঁ; ..... সে বলেছিল, দেখ বিদেশি পথিক! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজরিয়া বলে উপহাস করে। তাদের সে আঘাত আমি সইতে-উপেক্ষা করতে পারি, আমার সে সহ্যশক্তি আছে; কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর! তুমিই কেন আমায় ভালবাসি বলে উপহাস করছ? ওগো সুন্দর শ্যামল! তুমি কেন এ হতভাগিনীকে আঘাত করছ? এ অপমানের দুর্বার লজ্জা রাখি কোথায়? জানি, আমি কালো কুৎসিত, তাই বলে ওগো পরদেশী, তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এমন করে মিথ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ করবার? ছিঃ ছিঃ আমায় ভালবাসতে নেই, ভালবাসা যায় না, ভালবাসতে পারবে না! এমন করে আর আমার দুর্বলতায় বেদনা-ঘা দিও না শ্যামল, দিওনা।

কাজরী কালো বলে তার যে অভিমান গল্পে লেখক তা পটভূমি করে তুলে এনেছেন। এটি কাজরীর হৃদয়াবেগকে ছাড়িয়ে একটি সমকালীন সামাজিক সমস্যাকেও চিহ্নিত করে। কালো নারী সমাজের অভিশাপ। ঘরের মেয়ে কালো হলে ক্ষতি নেই কিন্তু ছেলের বউকে দুধে-আলতা গায়ের বরণ হতেই হবে। এ মানসিকতা শুধু বিয়ের জন্য প্রস্তুত যুবকের নিজের নয় তার অভিভাবকেরও। নারী শিক্ষিত এবং সাবলম্বী হলেও কালো রং নিয়ে তার একটি সামাজিক সমস্যা আজো আছে। সামাজিক এ সমস্যার কারণে অনেক কালো নারীকে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়ার সাক্ষ্যও ইতিহাস দেয়।

মির্জাপুরের পাহাড়ের বুকে 'বিরহী' নামক উপত্যকা থেকে গল্পের পটভূমি তুলে আনা হয়েছে। ভাদ্রের কৃষ্ণ -তৃতীয়াতে যে সেখানে কাজরী উৎসবের আয়োজন করা হয় সেই চিত্রপটটি স্পষ্ট এই গল্পে। পাহারিয়াদের বর্ষা উৎসবকে কাজরী উৎসব বলা হত।

বিরহ হৃদয়ের ভাব প্রকাশের আবহে গল্পটি উপস্থাপিত হলেও কালো মেয়ের সমকালীন সামাজিক সমস্যাই এখানে পটভূমি তৈরী করেছে।

ঘুমের ঘোরে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৯১৯ এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'নূর' ফাল্গুন সংখ্যায়। 'ব্যাথার-দান' গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প এটি। গল্পের নায়ক আজহার। আফ্রিকার সাহারার মরূদ্যান সংলগ্ন সন্নিহিত ক্যাম্প থেকে সে ডায়রী লিখনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে আত্মকথা। ভালবাসার মানসীকে সে সেচ্ছায় ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগদান করেছে। প্রেমকে সে কামনার সাথে একাত্ম করে ভাবতে কোন ভাবেই রাজী নয়। তাই মানসীকে বন্ধুর হাতে সপে দিয়ে নিজেকে সার্বজনীন করে তোলার পথ খুজে নেয় যুদ্ধে যোগ দিয়ে। আজহার এখানে ব্যার্থ প্রেমিক নয়। সে স্বেচ্ছায় দু:খের সাথে কোলাকুলি করেছে। গল্পের অপর চরিত্র পরীও 'ময়ুরেশ্বর - ভীরভূম' থেকে বর্ণনা করেছে আত্মকথা। পরীর আত্মকথায় তার ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা এবং স্বামীর ক্ষমাসুন্দর হৃদয়ের কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পটিতে সমকালীন সমাজের একমাত্র প্রথম মহাযুদ্ধের উপস্থিতি ছাড়া আর কোন চিত্র পাওয়া যায় না। আজহারের যুদ্ধক্ষেত্রের কোন বর্ণনাও না পাওয়া গেলেও আফ্রিকার সাহারার মরূদ্যান সন্নিহিত স্থানে যে প্রথম মহাযুদ্ধের ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ১৯৩০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের পঞ্চম সংযোজন। আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প এটিও। কথক এক সাঁঝের আঁধারে পল্লীর পথ চলতে চলতে বর্ণনা করেছে তার বিরহ কাতর জীবনের কথা। বাল্যকালে খেলাচ্ছলে সে ভালোবেসেছিল মোতি নামের একটি বালিকাকে। তাদের পাড়াতেই মোতিদের বাড়ি। কিন্তু নিজের দীনতার কারণে সে মোতিকে ফিরিয়ে দেয়। মোতির বিয়ে হয় মস্ত বড় জমিদারের বি.এ. পাশ এক যুবকের সাথে।

গল্পটি নিছক প্রেম-বিরহের আবহে রচিত। সমকালীন সমাজের কোন চিত্র এখানে পাওয়া যায়নি। বাল্যসখীকে হারিয়ে গল্প কথক তার অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে মরেছে এখানে।

'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটি নজরুল সরাসরি গ্রন্থে সংযোজন করেন। 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের ষষ্ঠ এবং শেষ গল্প এটি। আত্মকথা বর্ণনামূলক দীর্ঘ একটি পত্র হচ্ছে 'রাজবন্দীর চিঠি'। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল থেকে 'শ্রীধুমকেতু' নামের এক রাজবন্দী লিখছে পত্রটি। যাকে লেখা হয়েছে পত্রটি তাকে সম্বোধন করা হয়েছে 'প্রিয়তমা মানসী' আমার বলে। দীর্ঘ পত্রটির প্রতিটি লাইনেই রয়েছে পত্র লেখকের অভিমান ভরা আত্মযন্ত্রণার কথা। এক নারীকে ভালবেসে সে পায়নি তার ভালবাসা। যে যন্ত্রণায় নারীজাতির প্রতি তার অসংখ্য অভাব, অভিযোগ, অভিমান প্রকাশ পেয়েছে পত্রটির প্রতিটি লাইন।

'রাজবন্দীর চিঠি' বিরহ কাতর হৃদয়ের হাহাকার সম্বলিত একটি ব্যর্থ প্রেমের পত্র। সমকালীন সমাজের কোন প্রতিফলন এতে ঘটেনি। তবে নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দী হিসাবে ছিলেন বেশ কিছুদিন এবং সেখানে জেলের ভেতরকার সম্পর্কে তার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি সমকালীন চিত্র পাওয়া যায় পত্রটির শেষে।

'রিক্তের বেদন' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজী ১৯৩০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'নুর পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায়। এটি 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। গল্পটি আত্মকথা বর্ণনামূলক। স্ব-হৃদয়ের রিক্ততার কথা, নিঃস্বতার কথা হাহাকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে গল্পে। নায়ক হাসিন তার প্রিয়তমার ভালবাসাকে এড়িয়ে যাবার জন্য যুদ্ধে যোগদান করে । সেখানেও সে প্রেমে পড়ে এক বেদুঈন মেয়ের। কিন্তু কোন জায়গাতেই হৃদয়ের পূর্ণতা পায়না সে। শাহিদার বিয়ে এবং বেদুঈন কন্যা গুলের মৃত্যুতে হাসিনের হৃদয়ে যে রিক্ততা তৈরী হয়েছে তাই মূলত 'রিক্তের বেদন' গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

গল্পটিতে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের যেসব চিত্র পাওয়া যায় তাহলো কথক যে সব জায়গা থেকে তার আত্মকথা বর্ণনা করেছে সেসব জায়গায় প্রথম মহাযুদ্ধের ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল। সৈনিকদের পোষাক ছিল খাকি রং এর *''খাকি পোষাকের ম্লান আবরণে এ কোন আগুন ভরা প্রাণ চাপা রয়েছে।''* মধুপুর থেকে আত্মকথা বর্ণণাকালে গল্প কথক যখন বলে *''নিশি শেষের গ্যাসের আলো পড়ে আমাদের মুখ গুলো কি করুণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে । ঐ ফ্যাকাশে আলোর পান্ডুর আভা প্রতিভাত হয়ে আমরা ঘুমন্ত সৈনিক বন্ধুদের সিক্ত নয়ন পল্লবগুলি কি রকম চক্‌চক্ করছে। ..... আজ এই প্রভাতের গ্যাসের আলোর*

Dhaka University Institutional Repository

মতই পাড়ুর রক্তহীন একটি তরুণ মুখ ক্ষণে ক্ষণে আমার বুকের মাঝে ভেসে উঠছে।'' এই উদ্ধৃতি থেকে বলা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিকদের ক্যাম্পে বা ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে সোডিয়াম বাতির উপস্থিতি ছিল।

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের প্রথম রচনা এবং প্রথম ছোটগল্প। 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পএটি। ইংরেজী ১৯১৯ এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'সওগাত' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম ছাপা হয়েছিল গল্পটি। গল্পের নামই হচ্ছে 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' অর্থ্যাৎ এক বাউন্ডেলে ছেলের আত্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে গল্পটিতে। উনিশ বছরের এক তরুণের বাউন্ডেল জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে ক.খ, গ, ঘ এই চারটি অংশ। তরুণের অসম্ভব দুরন্তপনার জন্য তার বাবা তাকে গ্রামের স্কুল থেকে শহরের স্কুলে নিয়ে ভর্তি করেছেন। সেখানেও সে তৈরি করে দুরন্তপনার নতুন অঙ্গন। তবে ক্লাশে সে যথেষ্টে ভাল। এরই মাঝে বার,তের বছরের এক কিশোরীর সাথে বিয়ে হয় তার। ঘটনাক্রমে এই কিশোরী মৃত্যুবরণ করলে অভানীয় পরিবর্তন হয় তরুণের। ফলে মা তাকে পুনরায় বিয়ে দেন। তাতেও প্রথম স্ত্রী রাবেয়ার স্মৃতি ভুলতে পারে না সে। বিরহ কাতরতায় টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এক পর্যায়ে বোর্ড সুপারিনটেন্ডেন্ট মশাই তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন।এমন কুপুত্রকে বাবাও তাজ্যপুত্র করেন। কিছুদিন পর তরুণের দ্বিতীয় স্ত্রী সখিনাও মৃত্যুবরণ করে। তারও কিছুদিন পর তার মা মারা যান। রিক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলার জন্য শেষে তরুণ যুদ্ধে যোগদান করে। এবং বাগদাদে গিয়ে মারা পরে। যা গল্পের প্রথমেই বলা হয়েছে।

এই গল্পে সমকালীন সমাজের যেসব চিত্র পাওয়া যায় তাহলো প্রথমতঃ বাল্যবিবাহ। বারতের বছরের একটি মেয়েকে সোমত্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। সখিনার বয়সের কথা উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায় সেও রাবেয়ার সমবয়সীই ছিল। দ্বিতীয়তঃ বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের কোন পছন্দ অপছন্দ ছিল না। বাবা-মা যেখানে বিয়ে ঠিক করবেন চোখ,কান বন্ধ করে সেখানেই কবুল বলতে হবে।

> মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষী গোবেচারা জাত হলেও তাদের একটা পছন্দ আছে। তারাও ভাল বর পেতে চায়। ..... অন্তত যার সাথে সারা জীবনটা কাটাতে হবে পরোক্ষেও যদি তার সম্মন্ধে বেচারীরা কিছু বলতে কইতে না পায় তবে তাদের পোড়াকপালী নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে।

সমকালীন সমাজের নারীর অবস্থানের দপর্ণ এটি। তৃতীয়ত ঃ প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিকরাই পল্টনে যোগাযোগ করত। গল্পের নায়ক তার রিক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলার জন্য পল্টনে যোগদান করেছিল।

'মেহের নেগার' 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প। এটি ইংরেজী ১৯১৯ এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'নূর' মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটিও আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প। নায়ক য়ুসুক বর্ণনা করেছে তার হৃদয়ের রিক্ততার কথা। য়ুসুফের বাড়ি ওয়াজিরিস্থানের পাহাড়ে। ঝিলন নদীর তীরে বেড়াতে এসে 'গুলশন' নামের এক তরুণীর প্রেমে পরে সে। যাকে সে মেহের নেগার বলে আখ্যায়িত করে। মেহের নেগারকে য়ুসুক

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নে দেখে ভালবেসেছিল। গুলশনের সাথে তার সেই স্বপ্ন মানসীর হুবহু মিল খুঁজে পেয়ে তাকেই সে মেহের নেগার বলে গ্রহণ করে। কিন্তু গুলশন য়ুসুফের ভালবাসাকে তার জীবনে অবাঞ্ছিত মনে করে এবং সে আত্মহত্যা করে। কারণ গুলশনের সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত লজ্জাজনক। তার মা রূপজীবিনী। শেষে য়ুসুফ তার শূন্য হৃদয়ের বেদনা ঘুচাবার জন্য দেশের তরে জীবন উৎসর্গ করে। যুদ্ধে যোগ দেয় সে।

সমকালীন সমাজের যে প্রধান চিত্রটি এখানে পাওয়া যায় তাহলো রূপজীবীকার মাধ্যমে বেঁচে থাকা। বাঈজীর পেশায় নিয়োজিত থেকেও তারাছিল সমাজের কাছে নিগৃহিত। বাঈবীর কন্যার এই জন্য যে আর্তনাদ তা প্রকাশিত হয়েছে,

> এই শহরে যে খুরশেদজান বাঈজীর নাম শুন, আমি তারই মেয়ে। বলেই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার সারা অঙ্গ কাঁপতে লাগল। সে বললে , রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য অপবিত্র ! ওগো আমার শিরায় শিরায় যে অপবিত্র পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।কেটে দেখ , সে লোহু রক্তবর্ণ নয়, বিষ জর্জরিত মুমুর্ষুর মত তা নীল - সিয়াহ! দেখলুম তার চোখ দিয়ে আগুনের ফিনকির মত তা জ্বালাময়ী অশ্রুনিগর্ত হচ্ছে।

উদ্ধৃতিটুকুতে সমাজে বাঈজী এবং তার অবস্থান খুব স্পষ্ট। বাঈজীর মেয়ে বলেই গুলশান য়ুসুফখানের ভালবাসাকে গ্রহণ করতে পারেনি। অর্ন্তজ্বালায় দগ্ধ হয়ে সে মৃত্যুতে মুক্তি খুঁজেছে। 'বাদল-বরিষণের' কাজরীর সাথে গুলশন চরিত্রের সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কাজরীর সামাজিক অবস্থান যদিও গুলশনের মত ছিলনা তথাপিও নারীর কালো, অসুন্দর রূপও ঘৃণ্যতার পর্যায়েই পরে। কালো, অসুন্দর মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না যথাযোগ্য ছেলের সাথে, তার সামাজিক অবস্থান ও সুন্দরী নারীদের মত নয়। গুলশন এবং মেহের নেগার দু'জনই মৃত্যুতে মুক্তি খোঁজে। সমকালীন একটি রাজনৈতিক চিত্রও এখানে পওয়া যায়।

> শুনলুম আমাদের স্বাধীন পাহারিয়া জাতিটার উপর ইংরেজ আর কাবুলের আমির দু'জনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।

সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক চিত্র এটি।

'রাক্ষুসী' গল্পটি ইংরেজী ১৯২০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'সওগাত' মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের পঞ্চম সংযোজন এটি। আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প এটিও। এক নারী এখানে বর্ণনা করেছে তার অভিষপ্ত জীবনের কথা। সমকালীন একটি নিটোল সমাজচিত্রের পটভূমিতে রচিত হয়েছে গল্পটি। পটভূমিটি চিরকালীন সমাজেরও একটি অতি বাস্তবচিত্র। গল্পে পাঁচুর বাপ অর্থাৎ রাক্ষুসীর স্বামী অতি সহজ সরল মানুষ। স্ত্রী বিন্দি। যে রাক্ষুসী নামে একসময় নব পরিচিতি লাভ করে গ্রামে। তাদের এক ছেলে দুই মেয়ে । সুখী সংসার। কিন্তু এরই মাঝে স্বামী পরকীয়া প্রেমে পড়ে একেবারে বিয়ের প্রস্তুতি নেয়। বিন্দি তখন কোন উপায়ান্তর না দেখে স্বামীকে খুন করে। সাত বছরের জেল হয় বিন্দির। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরেই সে রাক্ষুসী নামে নবপরিচিত হয়। গ্রামের সবাই তাকে ভয় করে। নানা অপবাদে জর্জরিত করে। যার জন্য মেয়ের বিয়ে হয়না।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নিচু শ্রেণীর এই যে চিত্র তা নিম্নশ্রেণীর অতি নৈমিত্তিক চিত্র। নিচু শ্রেণীর বেশীর ভাগ নারীই এই বাস্তবতার শিকার। পরকীয়া প্রেম,একাধিক বিয়ে পুরুষের এই নীচ আচারণ প্রতিনিয়ত কাদায় নারীকে,পাগল করে, মৃত্যুতে মুক্তি খুঁজতে বাধ্য করে। *''আমায় পাগল করেছে কে? এই মানুষ গুলোইত''* নির্যাতিত নারীর এই আর্তনাদ সমকালীন সমাজের কাছে, সর্বকালীন সমাজের কাছে।

' সালেক)গল্পটি 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের ষষ্ঠ গল্প। গল্পটি ইংরেজী ১৯২০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'বকুল' আষাঢ় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষাতে বর্ণিত হয়েছে গল্পটি। সমকালীন সমাজের চিত্র এতে থাকলেও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াও এখানে রয়েছে। হঠাৎ করেই এলাকায় এক দরবেশের আবির্ভাব ঘটে। সবাই ছুটে যায় দরবেশের কাছে। তার পাদপদ্মে উৎসর্গ করতে চায় নিজেকে। কিন্তু দরবেশ নিরুত্তর। খবর পৌঁছে শহরের কাজীর কাছে। সেও ছুটে আসে। দরবেশকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। শেষে দরবেশ এই নাছোরবান্দা কাজীর প্রতি সদয় হন। তাকে উপদেশ দেন আগামীকালের জুম্মার নামাজে ইমামতি করার সময় দু'বগলের নিচে দুইটি মদের বোতল নিয়ে দাঁড়াতে। তারপর নামাজ পড়ার সময় সেই মদের বোতল দুটি জায়নামাজে ভেঙ্গে দিতে। দরবেশের নির্দেশে কাজী সাহেব তাই করলেন এবং এই গুরতর অপরাধের জন্য শাস্তি পেলেন পদ এবং পদবী হারিয়ে।

উল্লেখ্য,সমকালীন সমাজের যে প্রতিফলন এই গল্পে ঘটেছে তাহলো পীর, ফকির, দরবেশের প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্বলতা। যে দুর্বলতার কাছে হার মানে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি রাও। *''শহরের কাজী শুনলেন সব কথা। তিনিও ধন্না দিতে শুরু করলেন দরবেশের কাছে। দরবেশ যতই আমল দিতে চান না , কাজী সাহের ততই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকেন।''* শুধু কাজী চরিত্রটির মধ্যদিয়ে সমাজের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি চিত্র ফুটে ওঠেছে এখানে। দরবেশ ফকিরের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের অনেক অপকর্মের পাপ থেকে শুদ্ধি পেতে চায়।

> দরবেশ বললেন অনেককেই ভব -যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাওত দেখতে হবে। ..... তিনি যখন শহরের কাজী ছিলেন, তখন হয়ত ন্যায়ের জন্যেও যা দিগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তারাই উত্তম-মধ্যম প্রহারের সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না। আর যা দিগে অবিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন তার প্রতিশোধ নিলে তারা যে রকম নিষ্ঠুরভাবে, তার চেয়ে শূলে চড়ে মৃত্যুও ছিল শ্রেয়ঃ

দরবেশের প্রতি কাজী সাহেবের এই যে আশক্তি এবং সমাজে নিরপরাধ ও নিরীহ মানুষের প্রতি কাজী সাহেবের এই যে অন্যায়-অবিচারের চিত্র তা নজরুল সমকালীন সমাজ থেকে তুলে আনলেও এ চিত্র সর্বকালের সমাজের চিত্র।

' স্বামীহারা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ ইংরেজী এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'সওগাত' ভাদ্র সংখ্যায় । 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের সপ্তম গল্প এটি । সমকালীন নিটোল সামাজিক পটভূমির উপর রচিত এই গল্পটি আত্মবর্ণনামূলক। পড়শীবোন সলিমার কাছে স্বামীহারা বেগম বর্ণনা করেছে তার অভিষপ্ত নারী জীবনের কাহিনী । সমাজের কাছে স্বামীহারা এক নারীর আর্তনাদ এই কাহিনী । বেগম অতি নিম্নঘরের এক মেয়ে । বাবা, মা

Dhaka University Institutional Repository

ও অপর তিন ভাই বোনের সুখের সংসার তার। ছোটবেলাতেই তিন ভাইবোন এবং বাবা মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় মা একমাত্র সন্তান বেগম কে নিয়ে বিপাকে পড়লে দয়ার হাত বাড়িয়ে দেন তার সই মা। সই মা তার বি, এ পাশ ছেলের পুত্রবধূ করেন বেগমকে। কিন্তু অতিউচ্চ বংশ এবং প্রভাবশালী ঘরে নিচু বংশের গরীব ঘরের বেগমের বিয়েকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনা চারপাশের লোকজন। কিন্তু কান দেয়না বেগমের স্বামী, শাশুরী। সুখের জোয়ারে ভেসে যায় বেগম। এর মাঝেই বেগমের মা মারা যান। এলাকায় মহামারী আকারে দেখা দেয় কলেরা। জনসেবা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে বেগমের স্বামী। সাথে সাথে শাশুড়ীও ঢলে পরে মৃত্যুর কোলে। এরপর বেগমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়। তারপর সমাজের নিষ্পেষণে পাগল হয়ে যায় বেগম।

'স্বামীহারা' গল্পটিতে সমকালীন যে সমাজচিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলা যায় এ সমাজচিত্র ও সর্বকালীন। পূর্বোক্ত 'রাক্ষুসী' গল্পেও অবলা নারীর প্রতি সমাজের একটি করুণ পেষণ চিত্রের আলোচনা করা হয়েছে। 'রাক্ষুসী'ও সমাজের অনাদর, অবহেলা আর মানসিক নিষ্পেষণে পাগল হয়েছে। একই কারণে পাগল হয়েছে স্বামীহারা বেগমও। তবে দু'জনের প্রতি সামাজিক নিষ্পেষণের দুটি ভিন্ন পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে। এরা দু'জনই সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারী। কাজেই বলা যায়, সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীরাই সমাজের নির্যাতনের শিকার বেশী হয়। কারণ এরা পুরুমাত্রায় অবলা। পুরুষের বলই তাদের বল। বেগমের ভাষায়,

> খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে'হবার আগেই তারা গোরে যায়। ------- আমার বিয়ের মত এত বড় একটা অস্বাভাবিক কান্ডে গ্রামময় মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। বংশে নিকৃষ্ট, সহায় সম্বলহীন আমাদের ঘরে সৈয়দ বংশের বি, এ পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে হওয়া ঠিক যেন রূপ কথার ঘুটে কুড়েনির বেটীর সাথে বাদশাজাদার বিয়ের মতই ভয়ানক আশ্চর্য ঠেকছিল সকলের চোখে !------যখন তাঁর লাশ কাঁধে করে বাইরে আনা হল তখন ওদের কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে বললে 'যা শয়তানী, বেরো ঘর থেকে এখনি। তখনি বলেছিলুম বুনিয়াদী খানদানের উপর নাগ চড়ান , সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইলো না কেউ; বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস না! আর ইচ্ছা হয় চল, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি।

বেগমের এই বর্ণনায় সামাজিক নিষ্পেষণের প্রতি নিম্নশ্রেণীর একজন নারীর এই যে আর্তনাদ তা শুধু একজন বেগমেরই শুধু নয়। নির্যাতিত নিষ্পেষিত সকল নারীর। নজরুল নিম্নশ্রেণীর নারীদের সামাজিক নিষ্পেষণের চিত্র এঁকেছেন 'মৃত্যুক্ষুধা'তেও। সমাজের সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে না মিশলে সমাজকে এভাবে তুলে আনা সম্ভব নয়। সমকালীন সমাজের অপর যে চিত্রটি গল্পে পাওয়া যায় তা হচ্ছে মহামারী আকারে কলেরা। এই মহামারীতে গ্রাম কি গ্রাম মানবশূন্য হয়ে পরা। বসন্ত, প্লেগ এসব রোগের মহামারী আকারে সমাজে প্রবেশের সামাজিক চিত্র ও পাওয়া যায় অনেক গ্রন্থে।

'দুরন্ত পথিক' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজী ১৯২০ এবং বাংলা ১৩২৭সালের 'মোসলেম ভারত' শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অষ্টম তথা শেষ সংযোজন। লেখকের ভাষাতেই রচনাটি 'কথিকা'। সমকালীন সমাজের আবর্তে লেখকের কল্পনা প্রসূত রচনা এটি। বলা যায় 'দুরন্ত পথিক' লেখকের কাল্পনিক প্রতিকৃতি। যে মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য, সত্যের জন্য, কল্যাণের জন্য ছুটে চলে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে। মুক্তির জন্য, সত্যের জন্য, কল্যাণের জন্য লেখকের হৃদয়ে যে রিক্ততা তারই সার্থক রচনা 'দুরন্ত পথিক'। সমকালীন সমাজের এক প্রচন্ড অস্থিরতা রচনাটিতে লক্ষ্য করা যায়, তা

> দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশীর সুর ধরিয়া। ..... এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ায় এক-আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখনো যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নতুন পথিকের সামনে ধরিয়া বলিল-এই দেখ,এদের পরিনাম! সেই খুলি মাথায় করিয়া নতুন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল, - আহা এরাই ত আমায় ডাক দিয়াছে! আমি এমনই পরিনাম চাই আমার মৃত্যুতেই ত আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব।

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে এই উপমহাদেশে যে প্রচন্ড অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে 'দুরন্ত পথিকের' মাঝে তারই প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে বলা যায়।

'পদ্ম গোখরো'শিউলিমালা গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। গল্পটি নজরুল সরাসরি গ্রন্থেই অন্তভুর্ক্ত করেন। সমকালীন সমাজের কিছুচিত্র ছাড়াও গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত এবং লোকপ্রচলিত আখ্যাণেরও চিত্র পাওয়া যায়। গল্পটির সার সংক্ষেপে দেখা যায়, জোহরা নামের এক অপূর্ব রূপবতী কন্যাকে একমাত্র পুত্র আরিফের পুত্রবধু করার সাথে সাথেই রসুল পুরের পীর সাহেবদের হারিয়ে যাওয়া জমিদারী পুনরায় ফিরে আসে। বধূ পয়মন্ত হয়ে উঠে সবার কাছে, সেই সাথে তার আদরেরও সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাড়ীর পুরনো প্রাচীরের ফাটল থেকে জোহরা আবিস্কার করে গুপ্তধন। সেই গুপ্তধনে আরিফ কলকাতায় কয়লার ব্যাবসা করে লাভবান হয় আশাতীত ভাবে। পুরনো জমিদারী ফিরে পায়। এদিকে জোহরাকে নিয়েও তারা পড়ে এক চরম বিপাকে। গুপ্তধন উদ্ধারের সময় সেখান থেকে বের হয়ে আসে দুটি পদ্মগোখরা। এবং সেই পদ্মগোখরা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় জোহরার দিকে। জোহরাও মাতৃস্নেহে আদর করে তাদের বাটিতে করে দুধ খাওয়ায়।

উল্লেখ্য, বিয়ের এক বছরের মাঝেই জোহরার দুটি যমজ সন্তান হয়ে আতুড় ঘরেই মারা যায়। জোহরা এই সাপ দুটির মাঝে সেই মৃত সন্তানদের খুঁজে মরে আর তার মাতৃজ্বালা প্রশমন করে। ক্রমে জোহরা এবং সাপেদের এই অস্বাভাবিক আচরণে বাড়ির সকলে ভয়ে বিরক্ত হয়ে জোহরাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় কুতুরপুরে। কুতুবপুরের সৈয়দ বংশের কন্যা জোহরা। বাবা পীর। জোহরা এসবের সবই বুঝল কিন্তু কোন বিতর্ক করল না। জোহরা চলে যাবার পর সাপ দু'টিও দিন দু'দিন বাড়িময় ভীষণ উৎপাত করে অন্তর্ধান হল। অন্যদিকে জোহরা বাবার বাড়িতে গিয়ে সাপ সম্পর্কে স্বামীর সাথে কোন কথা বলল না তবে দিন দিন শীর্ণ হাড় হয়ে উঠল। বাবার বাড়িতে জোহরার অবস্থানের ছয় মাস অতিক্রম করার পরও জামাই নিয়ে যাবার নাম না করলে এবং জোহরার শরীরেরও দিন দিন অধ:পতন ঘটলে জোহরার মা নিজেই জামাইকে বলে জোহরাকে কলকাতায় বা শশুর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ঠিক হয় পরদিন আরিফ কলকতায় নিয়ে যাবে জোহরাকে। আর সে রাতেই ঘটে অঘটন। জোহরা বাবার বাড়ি আসার সময় প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা পরে আসছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সেই গহনা ছিল তাদের পাশের কামরায়। রাতে চুরি হয় সব গহনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাকাত দু'জন চলে যাবার সময় চন্দ্রালোকে তাদের মুখ দেখতে পায় আরিফ। ডাকাত ওরই প্রাণ প্রিয় স্ত্রীর পিতা-মাতা দেখে লজ্জায়, ঘৃণায় জর্জরিত হয় আরিফ। তার উপর 'চোরের মার বড় গলা'। ঘুম না ভাঙতেই তাদের আচরণে আরো ক্ষুব্ধ হয় আরিফ। এ বাড়ির আর জল স্পর্শ না করে আরিফ চলে যেতে চাইলে জোহরার মার মিনতিতে সে খেয়ে যেতে রাজি হয়। শেষে আরিফকে তারা বিষ খাইয়ে মারতে চায়। রক্তবমি করতে করতে আরিফ কোন রকমে কলকাতার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসে। সেই কামরাতেই একজন ডাক্তারের উপস্থিতি ছিল বলে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যায় আরিফ। তারপরই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দৈবকে ভিন্ন আর কাউকেই সে দোষী করবেনা। এবং তিনদিন পর ভগ্ন শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সেদিকে আরিফ চলে আসার পর জোহরা মাকে 'রাক্ষুসী' বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে। জোহরার বাবা 'পীর' বলে এলাকায় কেউ বাড়িতেও ঢোকার সাহস পায়নি অভিশাপের ভয়ে। গ্রামের সবাইকে জোহরার বাবা-মা জানিয়ে দিল গতরাতে জোহরার সব গহনা চুরি হয়ে গেছে এবং এজন্যে জামাই শহরে গেছে পুলিশে খবর দিতে। তিনদিন তিন রাত জোহরা একেবারেই অভুক্ত থাকলে বাবা তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরাও মক্কা যাত্রা করেন। আরিফ বাড়ি ফিরে যাবার পরই জোহরাও পৌছায়। জোহরা স্বামীর পায়ে আছড়ে পড়েই মূর্ছা যায়। এতকিছুর মাঝেও জোহরা ভুলতে পারেনি তার পদ্ম গোখরোদের। কারও কাছে ওদের সম্পর্কে জানতে চায়নি। গভীর রাতে তার মৃত খোকাদের স্বপ্ন দেখে সে ফিরে যায় তার কবরস্থানে। সেখানে উপস্থিত হয় পদ্মগোখরো যুগল। আবার পূর্বের সম্পর্ক তৈরি হয় পদ্মগোখরোদের সাথে জোহরার। সন্তানস্নেহে আদর করে তাদের সে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা জোহরার বাবা লুকিয়ে জোহরাকে দেখতে এলে তাদের চাকরাণী ভূত বলে চিৎকার করে উঠে। এদিকে জোহরারও উঠে প্রসব ব্যাথা। চাকারাণীর ভূত ভূত বলে চিৎকারে পদ্মগোখরো তাড়া করে ভূতকে। ফলে পদ্মগোখরোর কামড়ে মারা যায় জোহরার বাবা এবং জোহরার বাবার প্রহারে মারা যায় পদ্মগোখরো। আরিফের মুখে জানা যায়, মক্কা যাওয়ার পথে জোহরার মা রাস্তায় কলেরায় মৃত্যুবরণ করে। পরদিন সকালবেলা গ্রামে রটে যায় জোহরা দুটি মৃত সাপ প্রসব করে মারা যায়।

গল্পটিতে সামাজিক আবহ থাকলেও সমকালীন সমাজের তেমন চিত্র পাওয়া যায় না। অভাব মানুষকে কতটা নীচতায় পৌছে দিতে পারে তা জোহরার বাবা-মার আচরণে ফুটে উঠে। অভাবের তাড়নায় তারা মেয়ের গহনা চুরি করে রাতের অন্ধকারে। অথচ জামাই তাদের আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে তারা আত্মসম্মানবোধে তা নেননি। এ চিত্রটি যুগোত্তরেরও।

জমিদারদের সমকালীন একটি চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে এভাবে ,

> তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পুর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্যে এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

'পালকির' প্রচলনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় গল্পে। মেয়েরা পালকিতে চড়ে গল্পে দূরের যাত্রা করতো। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেত পালকি করে খান্দানী ঘরের বৌ-ঝিরা। *"তিনদিন তিনরাত্রি যখন কন্যা জল স্পর্শও করিল, তখন পিতা পালকি করিয়া কন্যাকে*

Dhaka University Institutional Repository

রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।" এসব সামাজিক চিত্রগুলো সমকালীন।

জিনের বাদশা গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৯৩০ বাংলা ১৩৩৭ সালের 'সওগাত' বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। 'শিউলি মালা' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প এটি। গল্পের পটভূমি হচ্ছে ফরিদপুর জেলার 'আরিয়ল খাঁ' নদীর ধারের মোহনপুর গ্রাম। যার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং চাষী। কয়েকঘর কায়স্তও আছে তবে তারা মুসলমানদের ধারে কাছে ঘেঁষে না। গ্রামের মুসলমানদের মাতব্বর চুন্নু ব্যাপারী। তার তিন স্ত্রী এবং সাত ছেলে। চুন্নু ব্যাপারী নিজে হাতে চাষ করে এবং তাতে সাহায্য করে তার সাত ছেলে ও তিন স্ত্রী।

আল্লারাখা ওরফে কেশরঞ্জণ বাবু চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান। তার প্রথম সন্তান দুটি মেয়ে এবং তারা মৃত কিনা তা অস্পষ্ট। আল্লারাখা অসম্ভব ডানপিটে। একই গ্রামের নারদআলী শেখের মেয়ে চাঁনভানুকে ভালোবাসে সে। চাঁনভানু নারদ আলীর একমাত্র সন্তান। তাদের অবস্থা ভালো। এর মাঝেই চাঁনভানুর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় পাশের গ্রামের ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে। এই সংবাদে আল্লারাখা মরিয়া হয়ে উঠে চাঁনভানুকে বিয়ে করার জন্যে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। জিনের বাদশা সেজে চাঁনভানুর বাবার কাছে দৈব চিঠি প্রেরণ করে। কিন্তু কিছুতেই ঠেকাতে পারে না বিয়ে। কারণ কন্যার বাবা জিনের বাদশার দৈব চিঠিকে বিশ্বাস করলেও বরের বাবা তা করতে রাজি হয়নি। তার কারণও ছিল। তা হচ্ছে ,

> আসল কথা ছেরাজ অতিমাত্রায় ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল, চাঁনভানু বাপ-মার একমাত্র সন্তান তার উপর সুন্দরী বলে কোনো বদমায়েস লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্তি করছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করতো না, বা তাকে ভয় করতো না- এমন নয়। তবে সে মনে করছিল, যে লোকটা এই কীর্তি করছে- সে নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ-সিদ্ধ গুণীকে দিয়ে সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না! এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোন মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে?

অবশেষে চাঁন ভানুর বিয়ে হয়ে যায় ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে। এরপরই আল্লারাখার মাঝে ঘটে অভাবনীয় পরিবর্তন। তার ডানপিটে ভাব থেকে পুরোপুরি শান্ত, ধীর, স্থীর জীবনে ফিরে আসে সে। লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে বাবার সাথে জমিতে হাল ধরতে রওনা হয়।

এটা হলো 'জিনের বাদশা' গল্পের কাহিনী সংক্ষেপ। গ্রামের সহজ-সরল, সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা নিয়ে গল্পটি রচিত। লোককথার সুর পাওয়া যায় আল্লারাখা চাঁনভানুর ভালোবাসায়। গল্পে সমকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে প্রথমতঃ মুসলমানের সাথে কায়স্তদের সামাজিক সম্পর্ক। কায়স্তরা মুসলমানদের কতটা হীনমন্যতার চোখে দেখতো ফরিদপুরের একটি গ্রাম থেকে তা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ,

> ফরিদপুর জেলায় 'আড়িয়াল খাঁ' নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম। নাম মোহনপুর। অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী। মুসলমান। গ্রামের একটেরে ঘরকতক কায়স্ত। যেন ছোঁয়াচের ভয়েই ওরা একটেরে গিয়ে ঘর তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কী ফেজের উপরের কালো ঝাড়িটা যেমন হিন্দুত্বের টিকির সাথে আপোষ করতে চায়, অথচ হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি গ্রামের মুসলমানেরা কায়স্থ পাড়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলেও কায়স্থপাড়া কিন্তু ওটাকে ভূতের বন্ধুত্বের মতই ভয় করে।

মুসলমানদের প্রতি কায়স্থদের এই যে মনোভাব তা সমকালীন তো বটেই ঐতিহাসিকও। একটি সুচিবায়ুতা যেন বরাবরই কায়স্থদের মাঝে কাজ করে। নিজেদের চেয়ে উচ্চবংশ তারা আর ভাবে না। দ্বিতীয়তঃ যে সমাজ চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে পুত্রের বিয়ের মাধ্যমে কন্যার সম্পত্তির লোভ। চাঁনভানুকে পুত্রবধূ করার পেছনে ছেরাজ তালুকদারের সেই লোভটিই মুখ্য হয়ে কাজ করেছে। যে লোভে সে জ্বিন-ভূতের ভয়কেও পরোয়া করতে রাজি হয়নি। সমাজের অতি বাস্তব ঘনিষ্ঠচিত্র এটি। ছেরাজ তালুকদারের ভাষায় *'এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোন মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্যে বসে আছে'।* মেয়েদের পুকুরে গিয়ে গোছল করার সমকালীন সমাজ চিত্রটি দেখা যায় চাঁনভানুর মধ্যদিয়ে।

'অগ্নি-গিরি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৯৩০ এবং বাংলা ১৩৩৭ সালের 'সওগাত' আষাঢ় সংখ্যায়। 'শিউলিমালা' গ্রন্থের তৃতীয় সংযোজন এটি। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত গল্পটি। একদল দামাল ছেলের দুর্দান্তপনা নিরীহ একটি ছেলের প্রতি এবং এক তরুণীর নিরব ভালোবাসার জবাব দিতে হঠাৎ নিরিহ ছেলেটির অগ্নি-গিরির মত জ্বলে উঠা ও শেষ পর্যন্ত জেলে অন্তরীণ হয়ে দীর্ঘ সাত বছরের কারাদন্ড গল্পটির সংক্ষিপ্ত চিত্র। গল্পে নিরীহ জায়গীর সবুর আখন্দ-এর সাথে নজরুলের জায়গীর জীবনের একটি বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়। নজরুল ত্রিশালের কাজীর শিমলা গ্রামে কাজী সাহেবদের বাড়িতে জায়গীর থেকে নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে পড়েছেন। ঐ গ্রামে নজরুলের বিশেষ কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না এবং সুযোগ পেলেই গ্রামের বখাটে দামাল ছেলেরা নজরুলকে জ্বালাতন করতো।

গল্পটি হৃদয়াবেগে পূর্ণ। সমকালীন সমাজের উল্লেখযোগ্য কোন চিত্র পাওয়া যায় না গল্পটিতে। তবে মৃত আমিরের বাবা যখন থানায় মিথ্যা নালিশ করেন এই বলে যে,

তার ইচ্ছা ছিল নূরজাহানের সাথে আমিরের বিয়ে দেন। আর তা জানতে পেরেই সবুর তাকে হত্যা করেছে। তার কারণ সবুরের সাথে নূরজাহানের গুপ্ত প্রণয় আছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি বহু সাক্ষী নিয়ে এলেন- যারা ঐ দুর্ঘটনার দিন নূরজাহানকে সবুরের পা ধরে কাঁদতে দেখেছে! তাছাড়া সবুর পড়াবার নাম করে নূরজাহানের সাথে মিলবার যথেষ্ট সুযোগ পেত।

আমিরের বাবার এই মিথ্যা সাক্ষীতে সবুরের দন্ড হলো। নূরজাহানের গায়ে কলংক লেপন হলো। যার ফলে দেশান্তরী হলো তারা। এ দৃশ্য সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার ধারক।

'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প শিউলিমালা। বিরহকাতর প্রেমের গল্প এটি। গল্পের নায়ক আজহার তরুণ ব্যারিস্টার এবং ভালো দাবাড়ু। নায়িকা শিউলি। শিউলির বাবা রিটায়ার্ড প্রফেসর চৌধুরী। তিনিও ভালো দাবাড়ু। আজহার ব্যারিস্টারি পাস করে শিলং বেড়াতে গেলে সেখানে তাদের সাথে পরিচয়, সখ্যতা এবং হৃদ্যতা দাবা খেলার সূত্র ধরেই। শিউলিদের বাড়িতে আজহারের যথেষ্ট আপ্যায়ন এবং শিউলির সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে এরই মাঝে তার। একমাস শিউলিদের বাড়িতে থাকার পর আজহার যখন চলে আসার জন্যে প্রস্তুতি নেয় তখনি সে বুঝতে পারলো তার প্রতি শিউলির গোপন অনুরাগ। আশ্বিন মাসের শেষের সন্ধ্যা। বিদায়ের পূর্বে আজহার যখন শিউলিকে জিজ্ঞেস করলো,

> আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন অমনি আশ্বিন মাস- এমনি সন্ধ্যা আসবে- তখন কি করব বলতে পারো?
> শিউলি তার দু'চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল -'শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও।'
> ''আমি নিরবে সায় দিলাম -তাই হবে! জিজ্ঞাসা করলাম -''তুমি কি করবে!'' সে হেসে বললো, ''আশ্বিনের শেষেত শিউলি ঝরেই পড়ে।''

বিরহকাতর হৃদয়ের বর্ণনাই গল্পটির মুখ্য বিষয়। সমকালীন কোন সমাজচিত্র এতে ফুটে উঠেনি। তবে দাবা যে তখন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের একটি অতিপ্রিয় খেলা ছিল তা বুঝা যায়।

'বনের পাপিয়া' নজরুলের একটি অগ্রন্থিত গল্প। গল্পটির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত 'নজরুলের ছোট গল্প (১৯৯৫) গ্রন্থে।' 'বনের পাপিয়া' লেখকের কল্পনাশ্রয়ী একটি গল্প। সমকালীন সমাজের কোন চিত্র এতে প্রতিভাত হয়নি। তবে পদ্মা নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে যখন বলা হয়,

> রমলা আবিষ্ঠার মতো পদ্মার ঢেউ দেখছিল... দূরে আবছায়ার মতো একটি ডিঙ্গি নৌকায় সরল ভাটিয়ালী সুরে কার বাঁশি বেজে উঠলো।
> এ চিত্রটি সমকালের আবর্তে। চিত্রটি মনে করিয়ে দেয় রাত জেগে জেলেদের পদ্মার বুকে ভেসে বেড়ানো। ভাটিয়ালী গানের সুরে সুরে নিজেদের কষ্টগুলো পদ্মার বুকে নিঙড়িয়ে দেয়া।

'পুরাণের' ব্যবহার করা হয়েছে গল্পটিতে। রমলার সাথে 'বনের পাপিয়া'র হৃদয়ের যে বিগূঢ়তম রহস্যের উন্মোচন ঘটানো হয়েছে এখানে কৃষ্ণ ও তুলসীর বক্তব্য উপস্থাপন করে তা পুরাণেরই ধারক। ''রমলা বললো, *ঐ পাখির কণ্ঠে বৃন্দাবন কিশোরের আহবান শুনি। ওতো পাখি নয়, ওযে তার হাতের বেনুকা- ওকে বুকে ধরে আমি শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ পাই।*'' নারী মনের বিচিত্রতা, খেয়ালি আচরণ, অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনিত শূন্যতা রমলা চরিত্রটির মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গল্পে।

'বনের পাপিয়া' রচনা বা প্রকাশের কোন সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে গল্পের শুরুতেই যেহেতু ফরিদপুরের উল্লেখ রয়েছে- তাই অনুমান করা যায়, ১৯২৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নজরুল ফরিদপুর গিয়েছিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর সাথে। সম্ভবত তখনই কোন এক জ্যোৎস্নারাতে পদ্মার পাড়ে গিয়ে পদ্মার সুন্দরে মোহাবিষ্ঠ হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন 'বনের পাপিয়া' গল্পটি। পদ্মার সুন্দরের সাথে পুরাণকে একাকার করে কল্পনায় ভর করে লিখেছেন 'বনের পাপিয়া'। যেখানে সমাজ বাস্তবতার তেমন কোন রেখাপাতই ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ এই অভিসন্দর্ভের উপর পর্যালোচনাটি করা হলো। আমি পর্যালোচনাটি পৌন:পুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তারপরও বলা যায়, এটি অভিসন্দর্ভের পর্যাপ্ত পর্যালোচনা নাও হতে পারে। তিনটি উপন্যাস এবং উনিশটি ছোট গল্পের প্রকাশের ক্রমানুসারে আলাদা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নজরুলের সমাজ ভাবনা কতটা গভীর ছিল, তিনি সমাজের কতটা ভেতরে পদচারণা, অর্ন্তচালনা করেছিলেন তা তিনটি উপন্যাসে পাওয়া যায়।

উপসংহারে তিনটি উপন্যাসের সার সংক্ষেপে বলা যায় 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহে সমকালীন সমাজের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পটভূমি অংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা রাখা হয়েছে। নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রশিক্ষণরত যোদ্ধা ছিলেন। নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বলে কোন গবেষকের গবেষণাতেই প্রমাণ মেলে না। তবে কয়েকটি ছোট গল্পসহ 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে স্থানের নাম উল্লেখসহ এমন বাস্তবঘনিষ্ট বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যাতে দ্বিধাহীনভাবে অনেক সময় বলা যায় নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সমর নায়কও ছিলেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নরুলহুদা বোহেমিয়ান মানসিকতার।

উপন্যাসটিতে সমকালীন অপরাপর সমাজচিত্রের মাঝে মুসলিম নারীদের পর্দাপ্রথা, সামাজিক বন্ধকতা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার সামাজিক প্রতিকূলতাসহ হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্মদের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি এবং প্রথাগত দিকগুলো বর্ণিত হয়েছে।

'মৃতুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রতি লাইনে লাইনে মনে হয় সমকালীন সমাজকে নজরুল প্রকাশ করতেই ব্যস্ত থেকেছিলেন যেন। সমাজের বুক পোস্টমর্টেম করে তিনি তুলে ধরেছেন সমকালীন সমাজকে উপন্যাসে। দুটি পর্বে উপন্যাসের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে এবং শেষে দু'টি বক্তব্যকে একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে ঘটনাকে পরিনতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে অতি নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের প্রতি সামাজিক শাসন ও শোষন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের চিত্রসমূহ অতি বাস্তব ঘনিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে অসহযোগ, খেলাফত ও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর একটি সমকালীন বক্তব্য। এই পর্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনসার। আনসারও বোহেমিয়ান মানসিকতার।

প্রথম পর্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেজ-বৌ। তবে কুর্শি, প্যাঁকালে, হিড়িম্বা, হানপে, পটলি প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ বক্তব্যের কাছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে মনে হয়। যদিও অনেক চরিত্রই মাত্র একটি বা দু'টি বক্তব্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসে উপস্থাপিত সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সম্পর্কেওপটভূমি অংশে মোটামুটি ধারণা রাখা হয়েছে।

'কুহেলিকা' উপন্যাসটিতেও রয়েছে সমকালীন একাধিক সমাজচিত্রের প্রতিফলন। একটি জারজ সন্তানের আর্তিকে 'পটভূমি' করে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের বক্তব্য আবর্তিত হয়েছে। মেসের জীবনচিত্র, সমাজে নারীর অবস্থান, মামা বাড়ির আতিথেয়তা, জমিদারদের ব্যভিচার ইত্যাদি চিত্রের অবতাড়না ঘটেছে এই উপন্যাসে। সমকালীন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের চিত্র এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে তাহলো স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। প্রমত্ত, জয়তীদেবী, পিনাক পাণি, ভূণী, চম্পা, হারুন প্রমুখ চরিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে । উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উলঝলুল ওরফে জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের চরিত্রেও বোহেমিয়ান একটি ভাব প্রকাশমান।

উল্লেখ্য যে, এই বোহেমিয়ান চরিত্রটি নজরুলের ব্যক্তি জীবনের সাথেও একাত্ম হয়ে আছে। ব্যক্তি নজরুল জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন বোহেমিয়ান প্রকৃতির। প্রতিটি উপন্যাসেই নজরুলের সেই ব্যক্তি চরিত্রের মত একটি বোহেমিয়ান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় 'লেখকের ব্যক্তি জীবনের অনুপ্রবেশ ছাড়া কোন সার্থক রচনা সম্ভব নয়।' প্রতিটি উপন্যাসেই সমকালীন তিনটি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে জোড়ালো বক্তব্য নিয়ে। বলা যায়, নজরুল সমাজের সাথে নিজেকে একাত্ম্য করে ফেলেছিলেন বলেই সমকালীন সমাজচিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের প্রতিভাত ঘটেছে এভাবে।

উনিশটি ছোটগল্পের মাঝে এগারোটি গল্পই আত্মকথা বর্ণনামূলক। গল্পগুলোতে কথক তার আত্মকথা বর্ণনা করেছে । এই বর্ণনার ভেতর দিয়ে কোথাও সমকালীন সমাজের দৃশ্যপট উঠে এসেছে, কোথাও তার রিক্ত হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ছোটগল্পগুলোতে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের চেয়ে হৃদয়ের হাহাকারই বেশি উদ্ভাসিত। শিউলিমালা, অতৃপ্ত কামনা, বনের পাপিয়া এসব গল্পে সমকালীন কোন সমাজ ভাবনা বা সমাজচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, পর্যালোচনার সময় কোথাও কোথাও একই উদ্ধৃতি একাধিকবার ব্যবহার করতে হয়েছে এবং কোথাও কোথাও উদ্ধৃতি খানিক দীর্ঘ হয়েছে। তাছাড়া একই কথার পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে হয়তো কোথাও কোথাও। তবে এটা অবশ্যই সমাজের পৌন:পুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার সুবিধার জন্যেই করতে হয়েছে। ''নজরুলের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ'' -এর উপরে কাজ করতে গিয়ে নজরুলের কথাসাহিত্য থেকে একটি কথাই খুব স্পষ্ট করে জেনেছি আমি যে 'সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে একটি উৎকৃষ্ট কথাসাহিত্য একটি সমকালীন সমাজের ইতিহাসকে ধরে রাখে।'

সমমকালীন সমাজ-ভাবনা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরো অনেকে লিখেছেন কিন্তু তাদের কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ ভাবনায় সমকালীন সমাজের ইতিহাসকে তেমন করে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন করে পাওয়া গিয়েছে নজরুলে। খ্রিষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচার, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধর্মান্তকরণ, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বাল্যবিবাহ, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এসব সমকালীন সমাজচিত্র সমকালীন ঐতিহাসিক সত্যে জ্বাজ্বল্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

আমার বন্ধু নজরুল, প্রথম প্রকাশ, হরফ প্রকাশনী কলিকাতা ১৯৬৮	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশনী, ১৯৮৮,অশত	অরুনা কুমার শিকদার
উপন্যাসের শিল্পরুপ, প্রথম প্রকাশ, কালিকলম প্রকাশনী,	রণেশদাশ গুপ্ত
কুমিল্লায় নজরুল , আফিয়া খাতুন, কুমিল্লা , ১৯৭৬-	এ, এম কুদ্দুস
কাজী নজরুল ইসলাম :জীবন ও সৃষ্টি, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী ২৮৬, বি, বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা১৯৯৭	রফিকুল ইসলাম
কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কলকাতা ১৯৯১	রফিকুল ইসলাম
চাঁদ সড়কে নজরুল,নজরুল একাডেমী পত্রিকা	আকবর উদ্দিন
জনগনের কবি কাজী নজরুল ইসলাম , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কলকাতা , ১৯৯২-	কল্পতরু সেন গুপ্ত
নজরুল ইসলাম , করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ,সম্পাদক	মুস্তফা নূরুল ইসলাম
নজরুল জীবন, প্রথম প্রকাশ, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২	রফিকুল ইসলাম
নজরুল নির্দেশিকা. বাংলা একাডেমী ১৯৬৯	রফিকুল ইসলাম
নজরুল পরিচিতি, ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন	
নজরুল মানস সমীক্ষা	জি, এম, হালিম
নজরুল সমীক্ষা , নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	রফিকুল ইসলাম
নজরুলের শিল্পীসত্ত্ব, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা	রফিকুল ইসলাম
নজরুলের কথাসাহিত্য:মনোলোক ও শিল্পরুপ	আহমেদ মাওলা
নজরুলের উপন্যাস, নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯২	শান্তিরঞ্জন ভৌমিক
বাংলা সাহিত্যে নজরুল, ডি, এম, লাইব্রেরী কলকাতা	আজহার উদ্দিন খান
বাংলাদেশের ইতিহাসে (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড এটিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ	সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের ইতহাস, প্রগতি প্রকাশসন — কোকাআন্তোনোভা গ্রিগোরী ভোনগার্দ, লেভিন

গ্রিগোরী কতোভস্কি

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস — সুলেমান বড়ুয়া

মুসলিম বাংলা সাহিত্য
ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন — মুহাম্মদ এনামুল হক

সমকালে নজরুল ইসলাম,
ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী — মোস্তফা নূরুল ইসলাম

মোসলেম ভারত ,ভাদ্র : ১৩২৭ — মোহিতলাল মজুমদার

ভারতের ইতিহাস, মৌলিক লাইব্রেরী ,
কলকাতা, — অতুল চন্দ্র রায়।

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,
১৭৫৭- ১৯৪৭, নূরজাহান,ঢাকা , ১৯৭৬ — ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম

যুগ কবি নজরুল , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬ — আব্দুল কাদির

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা?
বর্ণালী , কলকাতা , ১৯৭৯ — কমলকুমার সান্যাল

সহায়ক পত্র পত্রিকা

নজরুলের কথাসাহিত্য,জীবনবোধও সমাজ চেতনা
দৈনিক জনকণ্ঠ,২৯ আগষ্ট ১৯৯৭ — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

নজরুল সমকালের কবি, চিরকালের কবি
দৈনিক জনকণ্ঠ,২৬মে ১৯৯৯ — সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ

নজরুলের মানস ভঙ্গি,দৈনিক জনকণ্ঠ,২৫মে ১৯৯৯ — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের উপন্যাসের প্রকাশকালানুক্রমিক সূচি

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস	সংকলন	পত্রিকা ও প্রকাশ কাল	
বাঁধন হারা শ্রাবণ ১৩৩৪ / ১৯২৭	নজরুল রচনাবলী প্রথম খন্ড	মোসলেম ভারত	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ আষাঢ় ১৩২৭ শ্রাবণ ১৩২৭ ভাদ্র ১৩২৭ আশ্বিন ১৩২৭ কার্তিক ১৩২৭ মাঘ ১৩২৭
মৃত্যুক্ষুধা ফাল্গুন ১৩৩৬ /১২২৯	নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড	সওগাত	অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ পৌষ ১৩৩৪ মাঘ ১৩৩৪ চৈত্র ১৩৩৪ ভাদ্র ১৩৩৫ আশ্বিন ১৩৩৫ কার্তিক ১৩৩৫ পৌষ ১৩৩৫ আষাঢ় ১৩৩৬ আশ্বিন ১৩৩৬ কার্তিক ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ পৌষ ১৩৩৬ মাঘ ১৩৩৬
কুহেলিকা শ্রাবণ ১৩৩৮/১৯৩১	নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড	নওরোজ	আষাঢ় ১৩৩৪ শ্রাবণ ১৩৩৪ ভাদ্র ১৩৩৪
		সাপ্তাহিক সওগাত	পৌষ - ১৩৩৫

উপর্যুক্ত তথ্য, রফিকুল ইসলাম রচিত 'নজরুল নির্দেশিকা, বাংলা একাডেমী ১৯৬৯' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের গল্পের প্রকাশকালানুক্রমিক সূচি

Dhaka University Institutional Repository

গল্প	গ্রন্থ	পত্রিকা ও প্রকাশ কাল
বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী	রিক্তের বেদন	'সওগাত' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, ১৯১৯
স্বামীহারা	রিক্তের বেদন	'সওগাত' ভাদ্র ১৩২৬, ১৯১৯
হেনা	ব্যথার দান	ব, মু, সা, পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬,১৯১৯
মেহের নেগার	রিক্তের বেদন	'নূর' মাঘ ১৩২৬,১৯১৯
ঘুমের ঘোরে	ব্যথার দান	'নূর' ফাল্গুন ১৩২৬,১৯১৯
রিক্তের বেদন	রিক্তের বেদন	'নূর' বৈশাখ ১৩২৭,১৯২০
সালেক	রিক্তের বেদন	'বকুল' আষাঢ় ১৩২৭,১৯২০
অতৃপ্ত কামনা	ব্যথার দান	ব, মু, সা, পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২৭,১৯২০
বাদল বরিষণে	ব্যথার দান	'মোসলেম ভারত' শ্রাবণ১৩২৭,১৯২০
দুরন্ত পথিক	রিক্তের বেদন	'মোসলেম ভারত' শ্রাবণ ১৩২৭
রাক্ষুসী	রিক্তের বেদন	'সওগাত' মাঘ ১৩২৭
সাঁজের তারা	রিক্তের বেদন	'মোসলেম ভারত' মাঘ ১৩২৭
অগ্নিগিরি	শিউলি মালা	'সওগাত' আষাঢ় ১৩৩৭
জিনের বাদশা	শিউলি মালা	'সওগাত' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭
পদ্ম গোখরো	শিউলি মালা	সাপ্তাহিক দুন্দুভি
রাজবন্দীর চিঠি	ব্যাথার দান	

উপর্যুক্ত তথ্য, রফিকুল ইসলাম রচিত 'নজরুল নির্দেশিকা, বাংলা একাডেমী ১৯৬৯' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।